কবিতা

বিশেষ পূজা সংখ্যা

কার্তিক ১৩৪৬

কবিতা

বিশেষ পূজা-সংখ্যা

কার্তিক

১৩৪৬

ক্রমিক সংখ্যা [redacted] ১৯

"এ যুগের চাঁদ হ'লো কাস্তে"

১

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ,
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে।
ছায়াপথে কোন্ অশরীরী উন্মাদ
লুকালো আস্‌তে আস্‌তে ?
স্ফীত ধমনীতে ঘোরে অনামিক শঙ্কা ;
হৃদয়ারণ্যে বাজে বর্ব্বর ডঙ্কা ;
ছাই হয়ে গেছে প্রতীক্ষী স্বর্ণলঙ্কা
নির্ব্বাণ সূর্য্যাস্তে।
হঠাৎ হাওয়ায় হাতুড়ির প্রতিবাদ :
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে ॥

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ,
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে।
বিপ্রলব্ধ প্রেতের আর্ত্তনাদ
মানা করে ভালোবাসতে।
সঙ্গমে মিছে খুঁজে মরি নিরাপত্তা ;
ক্রমায়াত ঋণে ন্যস্ত আমার সত্তা ;
আসে সে-বেতাল, তুমি যার বাগ্‌দত্তা,
দন্তিল হাসি হাসতে।
চৈতী ফসলে শটিত শবের স্বাদ :
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে ॥

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ,
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে।
নিষ্প্রতিকার ধৈর্য্যের পাকা বাঁধ
বাধা দেয় বানে ভাসতে।

আমাদের জ্ঞান আপ্তবাণীর ভাষ্যে ;
শান্তি জীবন্মৃত্যুর ঔদাস্যে ;
স্বার্থসিদ্ধি সাক্ষীর স্মিত আস্যে
উঞ্ছ ঠাসতে ঠাসতে।
বিকল প্রেমিক আমাদের প্রভুপাদ :
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে ॥

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ,
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে।
কল্পান্তের অনিকাম অবসাদ
ব্যাপ্ত স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যে।
শুষ্ক ক্ষীরোদসাগরে মগ্ন বিষ্ণু ;
নরপিশাচেরা পৃথিবীতে আজ জিষ্ণু ;
চিনেও চেনে না স্বালম্বী অসহিষ্ণু
সমবায়ী অপরাস্তে।
খণ্ডাবে কবে অমৃতের অপরাধ
কালপুরুষের কাস্তে ?

২

বিষ্ণু দে

আকাশে উঠল ও কি কাস্তে না চাঁদ
এ-যুগের চাঁদ হল কাস্তে !
জুঁই বেলে ঢেকে দাও ঘন অবসাদ,
চলো সখী আলো করো ভাঙা [illegible] ছাদ,
শুকাবে ঘামের জ্বালা মলয়প্রসাদ,
মরা জ্যোৎস্নায় চলো ভাস্‌তে।

ভয় কিবা ? কিছুতেই গণি না প্রমাদ,
হাতে হাত দোঁহে উঠি আস্তে।
কৈলাসসাধনায় কতো শত খাদ !
কষ্টে-কেষ্ট-লাভ জানো তো প্রবাদ !
আকাশে উঠ্‌ল কাস্তের মতো চাঁদ—
এ-যুগের চাঁদ বুঝি কাস্তে !

সুখে নেই, তাই ভূতে কিলানোর সাধ !
কল্কির দেরি আছে আস্‌তে।
অনাহার, অনাচার চলুক অবাধ,
টর্‌পেডো চষে' যাক্ নীলিমা অগাধ,
আজ আছি, কাল নেই, কেন দিই বাদ
নগদবিদায়ে আজ হাস্‌তে ?

আপাতত নেই শিরে বোমার ফ্যাশাদ্,
অভাবেও আছি বেশ স্বাস্থ্যে,
বর্গীর দলে ভেড়ে যতো প্রভুপাদ,
ঠগ্ আসে, বেণে পাতে চষমের ফাঁদ,
স্বার্থ ছিটায় মুখে মৃত্যুর স্বাদ,
চাঁদের উপমা তাই কাস্তে !

নৃসিংহ চিনি নাকো, নই প্রহ্লাদ।
শুধু চাই শুধু ভালোবাস্‌তে।
পোড়া ক্ষেত, সাইরেন্ হল ক্ষীণনাদ,
পিশাচের মুখে [illegible] মুখোস্ বিষাদ,
হৃদয়ে হাতুড়ি ঠোকে প্রেম, ওঠে চাঁদ—
এ-যুগের চাঁদ হল কাস্তে ॥

চেতন স্যাক্‌রা

অমিয় চক্রবর্ত্তী

সোনা বানাই। সাঁকোর বাঁ পাশে গয়না
কাঁচের বাক্সে, জান্‌লায় দ্রষ্টব্য ; জান্‌লার উপর ময়না
রেগে ওঠে তোমাদের ভিড়ে—ছোলা খাও, বলো "রাধে
রাধে" "কেষ্ট কেষ্ট"—বল্‌তে বাঁধে

গলিতে, তোমাদের অতীব নোংরা গলিতে,
সোনার সুন্দর, রূপোর রূপকার, এই নর্দ্দমার দোকান দেহলিতে
ধ্যান বানাই। এই আমার উত্তর।
ড্রেন, ধুলো, মাছি, মশা, ঘেয়ো কুত্তোর

আড়ৎ বেঁধে আছ, বাঁচো (কিমাশ্চর্য্য বাঁচা) এবং যমের কৃপায়, মরা ;
অমৃতস্য অধম পুত্র, বন্দী স্যাঁৎসেঁত্যেতে গলির ঘরে ইঁদুর-ভরা ;
নেই রাগ।—অবশ্য। আছ আনন্দে। খাও ভেজাল ঘিয়ের জিলিপি,
শিশু কাদায়, ধোঁয়ার সংসার, খুলে ওষুধের ছিপি

মা-বোনকে খাওয়াও—দয়ার ডাক্তার অন্তিম লাগ্‌লে,
তৎপূর্ব্বাবধি রান্নার পাকে কষে ঘোরাও ; নিজে ভাগ্‌লে
শক্ত সিনেমার সীটে, ইতর প্রাণের গিল্‌টি
মুখ-ভরা পান, দৃশ্য হলিউড্, মোক্ষের পিল্‌টি

ভোলায় ধিক্কার, সন্ধ্যেটা কাটে ; তবু রাত্রে জেগে ভাবো ভাবোই
কিছু একটা হয়তো হবে, বুঝিবা কোথাও যাবো, যাবোই—
কোথাও যাবে না, গলিতেই থাক্‌বে। বড়ো রাস্তায় যাদের বাসা
হাঁ ক'রে দেখ্‌বে তাদের মোটর, পনেরোটা বেড়াল, সখের চাকর—থাকবে খাসা,

কেউ ছোঁবে না তাদের ঘোড়-দৌড়, মদ-পাশা ; দরোয়ানের লাঠি
বাঁচাবে তাদের লুঠ-ভরা সিন্ধুক ; একটু ঈর্ষা করবে, দীর্ঘশ্বাস, তবু তাদের চাটবে মাটি
চাকুরির রাস্তায়। তোমরা ধার্ম্মিক, কৃষ্ণের জীব, বিদ্রোহ করো না, অদৃষ্ট মানো,
পরজন্মের পথ পাও গলিতেই ; আহা গদ্‌গদ মাদুলি, তাগা, মূর্ত্তি, বুকে টানো ;
গুরুর দর্শন, কর্ত্তার বাক্য, দলীয় ভক্তির অদ্ভুৎ দৈবে
মর্‌লে যাও স্বর্গে—জীবনকে বানাও নরক—বিশুদ্ধ আর্য্যামি সইবে
বিদেশীর শাসন ; যতক্ষণ আছে জাত, অধিকারী-তত্ত্ব, ম্লেচ্ছকে ঘৃণা
ভয় কি দেশের ? বাহিরের পরাজয় হবেই তো, (ভিতরে জীবন্মুক্ত) কলিযুগ কিনা।

ভাল ভাল সোনা, উত্তম উত্তর ; ছুঁড়ে তো মারা যায় না ?
গলিয়ে গলিতে মেশাই রোদ্দুরে, দাঁড়ের ময়নাকে দিই বায়না
গান শোনায় বনের ; চোখে আছে, আমার চাল্‌সের চোখেও, গাঁয়ে গঙ্গার উপর
শুভ্র ধাপ, তেঁতুলগাছের ঝিল্‌মিল্, প্রাণের ছাঁদ মেলাই রূপোর

চন্দ্রহারে, দোলাই কানের দুলে, আমার উত্তর মণিতে বাঁধি ;
জেলে দিতে পারি নে গলিকে (এবং তোমাদের), নই নৈতিক পল্টন, সভার বক্তা ইত্যাদি।
শুধু জানি আগুন, আগুনের কাজ, সৃষ্টির আগুন লাগ্‌লে প্রাণে
তীব্র হানে বেদনা জাগ্‌বার, আর্টের আগুন, মরীয়াকে টানে।

গর্ব্বিত আধবুড়োর উদ্ধত এই গয়না।
ভিড়ে কাঁচ ভেঙো না ;—বুলি, বুলি, রাম রাম, বলো ময়না
বলো ফার্সি, আরবি, ধার্ম্মিক গজল—ফিরে গলির গর্ত্তে
সোনার মার নাও সঙ্গে—পারো তো কিছু কিনো—থাক্, চাই নে খদ্দের ধরতে॥

হেমন্ত

জীবনানন্দ দাশ

আজ রাতে মনে হয়
সব কর্ম্মক্লান্তি অবশেষে কোনো এক অর্থ শুষে গেছে।
আমাদের সব পাপ—যদি জীব কোনো পাপ ক'রে থাকে পরস্পর
কিংবা দূর নক্ষত্রের গুল্ম, গ্যাস, জীবাণুর কাছে—
গিয়েছে ক্ষয়িত হয়ে।
বৃত্ত যেন শুদ্ধতায় নিরুত্তর কেন্দ্রে ফিরে এল
এই শান্ত অঘ্রাণের রাতে

যতদূর চোখ যায় বিকোষিত প্রান্তরের কুয়াশার ব্যাস
শাদা চাদরের মত কুয়াশার নিচে শুয়ে।
হরিতকী অরণ্যের থেকে চুপে সঞ্চারিত হয়ে
নিশীথের ছায়া যেন মেধাবী প্রশান্তি এক রেখে গেছে
প্রতিধ্বনিহীন, হিম পৃথিবীর পীঠে।
সুষুপ্ত হরিণ—লোষ্ট্র ; মৃত আজ ; ব্যাঘ্র মৃত ; মৃত্যুর ভিতরে অমায়িক।
জলের উপর দিয়ে চ'লে যায় তারা ; তবু জল
স্পর্শ করে না ক' ; সিংহদুয়ারের মত জেগে উঠে ইন্দ্রধনু
তাহাদের যেতে দেয় ; অদ্ভুত রুধির চোখে তবু তারা
অভ্যর্থনা করে না ক' আজ আর আলোর বর্ব্বর জননীকে।

বাংলার শস্যহীন ক্ষেতের শিয়রে
মৃত, বড়, গোল চাঁদ ;
গভীর অঘ্রাণ এসে দাঁড়িয়েছে।

অন্ধকার পথ চিরে।
মহাশূন্য রক্তশূন্য। পদ্ম-ঋতু। আকাশের ভ্রূনহীন সভা
আজ বন্ধ্যা :
নক্ষত্রের তিথি ভুলে, শ্মশানের ছাই হয়ে, এলো আজ
বর্ষা-সন্ধ্যা।

অকুন্তলা

প্রমথনাথ বিশী

বোম্বে মেল ছুটিয়াছে; দ্বিতীয় শ্রেণীর
গদী 'পরে বসে আছি; গাড়ী ধায় তীর-
বেগে; কর্কশ হুইস্‌ল শব্দভেদী বাণে
বর্ণমূক আকাশের মর্ম্মে গিয়ে হানে
মুহুর্মুহু; সঙ্গীহীন বসে বাতায়নে
বাহিরের পানে চেয়ে আছি অন্যমনে।

হঠাৎ ধরণী যেন হয়েছে তরল!
মৃত্যুমুখী স্রোত তার ছোটে অবিরল
প্রলয় নিশ্বাস লভি'; গাছপালা, বাড়ী,
নদীনালা, খালবিল, খেজুরের সারি,
ধানক্ষেত, কচি আখ, কৃষাণ, লাঙল,
বোঝাই গরুর গাড়ী আপক্ক ফসল,
ধূম্র-অনুমান পল্লী, নভে শঙ্খচিল,
আধডোবা শরবন, কমলিত ঝিল,
সর্পিল দিগন্তরেখা চলে গুটি গুটি,
হুস্ করে ছুটে যায় টেলিগ্রাফ খুঁটি,
এঞ্জিন-উদ্গত বাষ্প রচে ধূমকেতু,
ঝমঝম্ ঝঙ্কারেতে সাড়া দেয় সেতু,

কর্কশ হুইসুল আর; ছুটিয়াছে গাড়ী,
সৃষ্টির উজান মুখে লক্ষ্যহীন পাড়ি।
সন্ধ্যা নামে; পশ্চিমের মেঘ ভাঙা-ভাঙা,
সূর্য্যের ইটের পাঁজা গন্‌গনে রাঙা
অন্তর্লীন অগ্নিতাপে। ক্রমে দুই দিকে
পৃথিবীর শ্যাম নেশা হ'য়ে আসে ফিকে;
শালবন, তালবন, মাঠ রিক্তঘাস,
বাঁধের সঞ্চিত জলে ইস্পাত-আভাস,
শুষ্ক নদী, রুক্ষ গিরি; মন্দীভূত গতি,
লৌহ মৃদঙ্গের তাল দীর্ঘতর অতি;
বাহিরে ঝুঁকিয়া দেখি—এলো কতদূর?
ষ্টেশনে পশিল গাড়ী—সীতারামপুর।

যুগপৎ বহু শব্দ—চা, খাবার, জল,
কুলি, কুলি, মিহিদানা, সের কত বল্,
শব্দের মৌচাক যেন ভেঙেছে হঠাৎ।
আমারি গাড়ীর দ্বারে একি উৎপাত!
উঠিয়া দাঁড়ানু বেগে, আশা ছিল মনে
সাহেবী পোষাক মোর পড়িলে নয়নে
কুলিটা সরিতে পারে। সে আশা নিষ্ফল,
বঙ্গদেশে সিংহচর্ম্ম একান্ত অচল।
না মানে সাহেবে তারা, না মানে পোষাক;
চটিলাম বাঙালীর দুঃসাহসে; যাক্,
খুলিল গাড়ীর দ্বার; অন্য দিকে চেয়ে
রহিলাম বসে; ধিক্কারিনু স্ত্রীশিক্ষায়,
একাকিনী এরা সব কেন আসে যায়।

আবার ছাড়িল গাড়ী ; বেঞ্চে ওদিকের
বসিল মহিলা সেই ; আমি বাহিরের
দুর্নিরীক্ষ্য আকাশের অন্ধকার মাঝে
একাগ্র রহিনু চেয়ে, যেন হোথা রাজে
জীবনরহস্য মোর ; যেন তাহা পাঠ
নাহি করিলেই নয়। কত মাঠ, ঘাট,
রহিল ডাহিনে বামে। ফিরাইতে মুখ
হেরিনু মহিলাটিরে। বাঁ হাতে চিবুক
রাখি অন্যমনে বসি' ; নীলাভ আলোয়
দ্বিতীয় শ্রেণীর, আর রাতের কালোয়
এ কি মায়া সৃজিয়াছে ! যেন চেনা মুখ !
ভদ্রতা করিয়া রক্ষা বারেক উৎসুক
উদ্‌গ্রীব জিজ্ঞাসু নেত্রে লইলাম দেখি'।
মায়া কিম্বা মিথ্যা কিম্বা সত্য কিম্বা—এ কি,
লীলা নাকি ? কোথা হ'তে আসিল কেমনে ?
আমার বিস্ময় হেরি' প্রসন্ন নয়নে
(যেন কিছু হয় নাই, বারোটি বছর
অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত যেন বারোটি প্রহর !)
জিজ্ঞাসিল—'কুশল তো, আছেন তো ভাল !'
স্মৃতির মন্থনদণ্ডে চৈতন্য ঘোলালো
শুধু ক্ষণেকের তরে ; কহিলাম তারে—
'কোথায় চলেছ তুমি, দেখিনি তোমারে
বহুকাল, ভাল আছ ?'
বার বছরের
বিস্মৃতির মহারণ্যে অজ্ঞাতবাসের
দীর্ঘ প্রবাসের পরে এ কি দেখা আজ !
সর্ব্বজয়ী কাল যেন মনে বাসি' লাজ

ফণা করিয়াছে নত ! কাল নাগ যেন
কুণ্ডলি' আপন দেহ মুহূর্ত্তের হেন
একান্তে মিলালো ধীরে। সব আছে ঠিক ;
বেদনার শিশিরাশ্রু করে ঝিক্‌মিক,
যায়নি শুকায়ে আজো ; লঘু পদভারে
আনর্ত্ত শ্যামল তৃণ নিজের আকারে
পারে নাই ফিরিবারে ; সব স্বপ্নবৎ,
স্মৃতির পদাঙ্ক-আঁকা পুরাণো জগৎ !

সস্মরিনু আপনারে, প্রশংসিনু মনে
স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা, নারী জাগরণে ;
নহিলে হ'ত কি দেখা ! দু' একটি কথা,
ক্বচিৎ হাসির ঘায়ে ক্রমে নীরবতা
দ্বিধা, ত্রিধা হ'তে হ'তে হইল শতধা !
সে সব ফাটল পথে (বলি সত্য কথা)
অতি নিম্নে দেখা যায় আগ্নেয় আভাস,
মুহুর্মুহু বাহিরায় বাষ্পীয় নিশ্বাস
এড়ায়ে স্মৃতির মুষ্টি ; অধরের হাসি
ইঙ্গিতে জানায়ে দেয় আছে রাশি রাশি
তপ্ত রক্ত অগ্নিপুঞ্জ অন্তরে জাগ্রৎ,
এই তো জীবন আর এই তো জগৎ।

লীলা কে বা ? কে সে মোর ? নাই বলিলাম ;
সম্প্রতি সাক্ষাৎ ট্রেনে, যাবে সাসারাম।
যদিও মস্তক তার রয়েছে গুণ্ঠন
সীমন্তে সিন্দূর নাহি, খুসী হ'ল মন,

তবু নহি নিঃসংশয় (নারী মায়াবিনী !)
হয়তো হয়েছে ব্রাহ্ম, প্রগতিবাদিনী।
আলাপের ফাঁক দিয়ে মন মোর উড়ে
একছুটে চ'লে গেল সেই বহুদূরে—
সব চেয়ে বেশী ক'রে মনে পড়ে তার
অজস্র আলোল পুঞ্জ কুন্তলের ভার।
কভু সে মৌসুমি মেঘ দিগন্ত ব্যাপিয়া
বর্ষণ-ব্যাকুল ; কভু বেণীতে বাঁকিয়া
শীর্ণ অসিলতাসম উঠিত কাঁপিয়া
চকিত চিক্কণ ; কভু ফুলিয়া ফাঁপিয়া
উথলিয়া, উদ্বেলিয়া, ডুবাইত কূল
কালো বৈতরণী বারি ; কভু দিত ফুল
খোঁপা ঘিরি—কালো নভে রাশিচক্রসম !
কুন্তলের পটভূমে সে ছিল সতত
মরণের কৃষ্ণপটে জীবনের মত।
বলিতাম—'লীলা, বাঁধো দেখি খোঁপা আজ
জাপানী ধরণে' ; বলিত সে—'আছে কাজ,
পারিব না।' কিন্তু সন্ধ্যাবেলা দেখিতাম
বিদেশী গড়নে খোঁপা। কভু বা দিতাম
করবীর গুচ্ছ এক—'পরো লীলা চুলে ;'
ভাবিতাম (মিথ্যা কথা) গিয়েছে সে ভুলে।
কিন্তু এ কি কালো চুলে রক্ত করবিকা,
সায়াহ্নের মেঘে যেন সূর্য্যাস্তের শিখা !
হেন ফুল নাহি ছিল উদ্যানে আমার,
(কিম্বা অপরের) খোঁপায় তাহার
ওঠে নাই ক্রমে ক্রমে মোর সাধনায়।
কি বলিব ওতেই তো মরেছিনু প্রায় ;

সে চুলের ফাঁস দিয়ে মূঢ় চিত্ত, হায়,
ঝুলেছে সহস্রবার। লীলাও জানিত
কোথা দুর্ব্বলতা মোর ; হঠাৎ শাণিত
কাঁচি হাতে বলিত সে—রাগাতে আমারে
'দেব কেটে পোড়া চুল !' বলিতাম তারে
'আর নাই পার লীলা পারিবে না কভু
কাটিতে ও পোড়া চুল।' শাসাতো সে তবু
কাঁচি হাতে ; অবশেষে ফেলিত হাসিয়া
অর্থাৎ মনের কথা গিয়েছে ফাঁসিয়া
মোর কাছে।

মনে পড়ে সেদিনের কথা,
ফাল্গুনের তপ্তবায়ে বিমূঢ় মত্ততা
ছায়াদেহী কস্তুরিকা মৃগপাল সম
উধাও ছুটিতেছিল ; সেই সঙ্গে মম
মুগ্ধচিত্ত ছুটে গিয়ে করিল প্রবেশ
লীলার কুন্তলারণ্যে ; হারাইনু দেশ,
হারাইনু কাল, সেই আদি তমিস্রায় !
যুগপৎ মধু, মদ, শিশিরের নেশা
দুঃখের দ্রাক্ষার দ্রাবী সুরসার মেশা
অজস্র সর্পের বেগে স্নায়ুতন্ত্রীপথে
পশিল শরীরে মোর, সে শূন্য জগতে
ভ্রমিলাম পথভ্রান্ত পুরূরবা প্রায় !
বৃথা স্বপ্ন !

অন্যমনা দেখিয়া আমায়
বেঞ্চের নীচেতে নেমে মাথা করি হেঁট
খুলিয়া ফেলিয়া লীলা টিফিন বাস্কেট,

কবিত

কার্তিক, ১৩৪৬

সন্দেশ সাজালো প্লেটে দুই চারিখান,
কহিল সম্মুখে ধরি—'আগে কিছু খান্।'
স্বপ্ন তবে স্বপ্ন নয়! আবার সংসার
ইন্দ্রধনু দিয়ে বোনা মনে হ'ল; আর
অনুকম্পামিশ্র দয়া ভরিল আমারে
ভাবিলাম—ভগবান্ থাকিতেও পারে!
দেখিলাম লীলা ধীরে গোছায় জিনিষ;
মন্দ্রীভূতগতি ট্রেন দেয় তীব্র শিষ!
'এ কি, লীলা?' জিজ্ঞাসিনু; 'নামিবারে হবে।'
আজিকে স্বপ্নের শেষ এইখানে তবে!
কিন্তু তার আগে যদি শুধু একবার
কেবল ক্ষণেক লাগি গুণ্ঠনটি তার
খুলে যেত! অতর্কিতে নামিত সহসা
উপত্যকা পাদদেশে অকস্মাৎ-খসা
প্রচ্ছায় রাত্রির মত নিবিড় কুন্তল!
এত হয়—এইটুকু হবে না কেবল?
ব্যস্ততায় মাথা হ'তে নামিল গুণ্ঠন।
—নাই ভগবান্ আর বলে কোন্ জন!
কিন্তু এ কি! চুল এ যে ছোট ক'রে ছাঁটা!
আগ্রীবকুঞ্চিত কেশে ঢেকেছে গ্রীবা-টা!
'একি লীলা, চুল কোথা? কি রকম বেশ!'
কহিল সে—'ইস্কুলের হেড্ মিস্ট্রেস্
আমি, ছোট ক'রে ছাঁটা, সেখানে রেওয়াজ।'
ষ্টেশনে থামিল গাড়ী; 'আসি তবে আজ',
কহিল সে নতমুখী। নামাইনু তার
বাক্স শয্যা আদি; গাড়ী ছাড়িল আবার।

কয়েকটি কবিতা

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

পাপী

নিয়তই শুনি পায়ের শব্দ কার।
কালের চক্র ধেয়ে আসে বুঝি পিছে।
প্রেমের শয্যা কাঁটায় হয়েছে ভার।
দেয়ালেরা তবু কি যে ফিস্ফাস্ করে।

একেলা কাটাই

একেলা কাটাই দুর্গে সঙ্গীহীন।
জীয়ানো প্রাণীরা আধিদৈবিকে ক্ষীণ।
আকাশ-কুসুম ঝরে গেছে কবে মনে।
কালো আকাশেরা ঝুঁকে পড়ে বাতায়নে।

হিংসা এ নয়

হিংসা এ নয়। স্বপ্ন ও আশা মিলে
চলেছে নিয়ত শুনি কত পদপাত।
সুন্দর ওগো প্রিয়তম মোর, কবে
হারায়ে ফেলেছি নগরের মাঠে বাটে।

তুমি যে আসবে

তুমি যে আসবে শুনেছি লোকের মুখে—
আকাশ অথবা পৃথিবীর এই পারে,
উদয়াস্তের যুগসন্ধির ভালে,
স্বপ্ন অথবা জাগ্রত কোনকালে।

শাশ্বতী

রাতের আঁধার মিলায় উষার ভালে।
দিবসের আলো ম্লান সন্ধ্যার কূলে।
প্রেয়সী আমার! হেথায় তোমার জয়,
হৃদয় নেভেনি দিনরজনীর ছলে।

ঢেউ

শত বীজাণুর মতো
জড়াজড়ি করে এলে।
হায়রে! বালুর তটে
কখন মিলায়ে গেলে।

অন্বেষণ

চাঁদ বুঝি ডুবে গেছে।
আকাশের বালুতীরে
নক্ষত্রের যাত্রীদল চলে দিশাহারা।
হৃদয়-জোয়ারে আমিও চলেছি ভেসে
প্রেয়সী আমার।
ভাসে বুঝি দূরে, বারবার
ভাসে আর চকিতে মিলায়
মুখটি তোমার।

দু'দিন

হেমচন্দ্র বাগচী

সমস্ত রাত ধ'রে তারস্বরে চেঁচালো একটা পাপিয়া
'চোখ্ গেল, চোখ্ গেল—'
মাঝে মাঝে জল-পি-পির ডাক ;
কোকিলের পঞ্চম ত মাঝে মাঝে আছেই।
আর একটা নাম-না-জানা পাখী
ডাকতে লাগল—'কুরুর, কুরুর'—
মনে হ'ল, তা'র স্বর যেন
আমার কান থেকে চ'লে এল মাথায়
তারপর, এল একটা গাঢ় ঘুমের আবেশ—
'কুরুর, কুরুর!'
খেজুরের কাঁদি নেমেছে গাছে—
অশথের শাখায় প্রশাখায় কচি পাতার সমারোহ,
তারই সঙ্গে ছোট ছোট ফল,
মোটা মোটা ঝুরি-নামানো বুড়ো বটের উপরে
ব'য়ে চলেছে বৈশাখ-শেষের মেঠো হাওয়া,
অবিশ্রাম একটা সন্-সন্ সোঁ-সোঁ গর্জ্জন আসে কানে।
বনস্পতির ভাষার সঙ্গে মানব-ভাষা মিলিয়ে বলি :
'আছি বেঁচে,
অনন্তকাল ধ'রে তোমাদের সঙ্গে।
তোমাদের না দেখলে আমার প্রাণ জুড়োয় না।'

গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল।
আশে-পাশে কেউ কোথাও নেই।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে কে যেন
এদিক থেকে ছুটে ওদিকে যাচ্ছে চ'লে।
মনে হ'ল, বাইরে বেলফুলগাছগুলির মধ্যে
কে যেন আছে দাঁড়িয়ে।
নিঃশব্দ নীলরাত হারালো তা'র মাধুর্য্য—
ভয় পেলাম।
বাইরে বাঁশবনের মাথায় মাথায়
কাদের হাসি যেন গেল ভেসে—
একদিক থেকে আর একদিকে।
শুধু উত্তাল হ'য়ে উঠেছে অরণ্য।
পাতাঝরা বাঁশের ডগার উপরে নারিকেলের ঘন সার
চোখে পড়ে।
দক্ষিণের জানালা খুলে,
সেইদিকে রইলাম চেয়ে।
মনে হ'ল, মুক্তি পেলাম কয়েকটি মুহূর্ত্তের—
হু-হু ক'রে ব'য়ে চলেছে হাওয়া—
দৃক্‌পাতহীন, নির্ভীক।

কত জীবন-বন্ধন হ'ল শিথিল,
কত জীবন-স্পন্দন রইল থেমে!
কত মৃত্যু, কত হাহাকার—
মানুষের জগতের বৃথা আস্ফালন,
কিছুই সে রাখে নি মনে।

বাঁশের শাখাগুলি যেন আর্ত্ত দীর্ঘস্বরে
মিনতি জানায়।

আম জাম তেঁতুলের ঘন পাতাগুলির মধ্যে
জাগে বিদ্রোহ।
তবু ব'য়ে যায় বৈশাখশেষের হাওয়া
দৃকপাতহীন, নির্ভীক।
এ কি সেই হাওয়ারই অট্টহাসি—
শুন্‌লাম যা কাল রাতে
নির্জ্জন মাঠের নিরালম্ব, নিরাশ্রয় আত্মাদের আর্ত্তনাদ!
এ কি সেই হাওয়ারই মূর্ত্তি
মনে হ'ল যেন দেখলাম তা'কে কাল রাতে
উদাসিনী নায়িকার মত শ্বেতবাসা—
বেলিফুলের কুঞ্জগুলির মধ্যে!

তবু মনে হ'ল মুক্তি পেলাম কয়েকটি মুহূর্ত্তের,
মানব-জগতের দাপাদাপি থেকে মুক্তি!
রাজনীতি, সাহিত্য, শিক্ষা, সভ্যতা, ভাবীযুগ
—সব যেন একটি বিরাট শূন্যে আবর্ত্তিত হ'তে হ'তে
মিশে গেল হাওয়ায়।
দহ্যমান তৃণ, তরু, পশু-পতঙ্গের
মারণ যজ্ঞের যে হোম-হুতাশন জ্বেলেছেন সূর্য্যদেব
তা'রি জ্যোতিতরঙ্গের সঙ্গে গেল মিশে—
তারপর, আন্দোলিত হ'তে লাগল অরণ্য,
আর বাজতে লাগল কানে হাওয়ার সেই অট্টহাসি!

চতুর্ভ্যঃ 'খলু ভূতেভ্যঃ

অমিতাভ ঘোষ

আমি স্বয়ম্ভু আগ্নেয় তারা
সুরুশেষহীন অসীমাকাশে,
পিতামহদের মৃত্যুর ধারা,
আমি চঞ্চল আগ্নেয় তারা
তপ্ত লোহিত রক্তের ধারা
আমার বক্ষসাগরে ভাসে
ভাঙি' হিরণ্য-গর্ভের কারা
চির প্রদীপ্ত মহোল্লাসে।

কঙ্কালে মোর মূক ইতিহাস
মহারণ্যের পুঞ্জীভূত
অঙ্গার হ'য়ে ফেলে নিশ্বাস,
কঙ্কালে মোর মূক ইতিহাস
ইন্দ্রজালের স্মরণোচ্ছ্বাস
পিতামহদের মন্ত্রপূত,
প্রাণ-পুরুষের নাহি বিশ্বাস
আমি স্বয়ম্ভূ অবাঙশ্রুত।

দুঃসাহসিক যাত্রায় মোর
প্রাণ ভেসে যায় রুধির-স্রোতে,
ঈক্ষণে তবু স্বপ্নের ঘোর
দুঃসাহসিক যাত্রায় মোর
পাণ্ডু মেঘের সন্দেহ-ডোর
ছিঁড়িয়া বহ্নি-বিমানপোতে,
বাস্তবিকার আমি মনচোর
স্বতঃস্ফূর্ত্ত বহ্নিস্রোতে।

দক্ষিণায়নে বাম পদ রাখি'
সূর্য্যে আবরি' দখিন পদে,
কৃষ্ণ হীরকে আত্মারে ঢাকি'
তরল অগ্নি অঙ্গেতে মাখি'
মাতরিশ্বার ঝড় তুলে হাঁকি
পিতামহদের মৃত্যুমদে,
চতুর্ভূতেরে বন্ধনে রাখি
ব্রহ্মের মৃতশোণিত হ্রদে।

ধর্ম্মস্য তত্ত্বম্

গুহায় গুহায় ধর্ম্ম লুকায়ে আছে
ব্যাঘ্রের মত মেলিয়া করাল দন্ত,
কঙ্কালসার ভক্তেরা তবু বাঁচে
শিবি রাজা সম ধর্ম্ম-বাঘের কাছে
অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটে পাছে
অতি দুর্গম সাম্যবাদের পন্থ।
গুহায় গুহায় ধর্ম্ম লুকায়ে আছে
আশ্রয় তাই মাগিছে ভাগ্যবন্ত।

তবু ঘর্ঘর ঘুরিছে ভাগ্যচাকা,
বিপ্লব এসে গ্রাসিছে মনের শান্তি।
দুর্ভাবনায় দিন কাটে ফাঁকা ফাঁকা
দুর্গতিহরা দুর্গার ছবি আঁকা
বিধবার হাতে কে পরাবে রাঙা শাঁখা
কে ফুটাবে দেশজননীর মুখে কান্তি।
সাগরের পারে ঝুড়ি ঝুড়ি যায় টাকা
মিছে সংসার রজ্জু-ভুজগ-ভ্রান্তি।

ম্যাল্‌থসী ভূত ভবিষ্যপানে চেয়ে
খুঁজিয়া মরিছে জীবনের উপভোগ্য,
মানুষেরা চায় রাবণের সিঁড়ি বেয়ে
লভিতে স্বর্গ প্রেমের রাগিণী গেয়ে
মাধবীলতায় কুঞ্জকুটীর ছেয়ে
তবু আজো কেউ এলো না প্রেমের যোগ্য
ত্রিপীড়ার্ত্তীরা খুঁজিছে উর্দ্ধে চেয়ে
কোথায় মুক্তি কোথা সেই মহারোগ্য।

পাটা কবলুতি বাঁধা দিয়ে মহাজনে
খসিয়া খসিয়া পড়িছে অস্থি-মাংস,
ধর্ম্ম-বাঘের সনাতন গর্জ্জনে
নিরুপদ্রব ভীরুতা জাগিছে মনে
হীরক হতেছে অঙ্গার ক্ষণে ক্ষণে
প্রাণ-সুবর্ণ হতেছে ক্রমেই কাংস্য,
সাধ্য যে নাই দেবঋণ বর্জ্জনে
কোনোখানে নাই স্বরাজের ক্ষুদ্রাংশ।

অনুর্বরা

[illegible]মেষ রায়

বাঁকুড়া জেলার শুষ্ক ঊষর গিরিবলয়িত প্রান্তভূমি
মানভূম সাথে মিশেছে যেথায় বিহারদেশের হস্ত চুমি',
পশ্চাতে যার কয়লার খনি ফুকারিছে বিষ বনানীশেষে
বার্ন্‌পুরের কলের চুল্লী-বহ্নি-নিশ্বাস বাতাসে মেশে,
আমি সেথা যাপি একেলা দিবস নিরালা মরুর নির্বাসনে
সাঁওতাল কুলি বাগ্দী চাষা ও বাউড়ি-হাড়ির সঙ্গ সনে।

হেথা নাই খাল সরসী সায়র সাগরবাহিনী স্রোতস্বিনী,
তপ্ত বালুকা শিলা ও কাঁকর রয়েছে শ্যামল পরশ জিনি'।
হলের ফলায় ফলে না ফসল ভেদিয়া মাটির রুক্ষ বুক,
অন্ন-বিহীনউদর কৃষক শুঁড়ির দুয়ারে মিটায় ভুখ।
রৌদ্র-দাহন প্রান্তর জুড়ি' অমারি মতন দৈন্য ক্ষুধা,
নীরস প্রাণের ব্যথায় রচিনু তাই এ রঙিন রাখীর সুতা।

পর্ণকুটীর-বাতায়ন খুলি হেরিতে রৌদ্র মেঘের মেলা,
বিরামশ্রান্ত অবসর বহি পোহাই দীর্ঘ পহর বেলা,
তৃণের পাতায় তরুর শাখায় বৈশাখ-পদচিহ্ন আঁকা,
গগন-খেয়ার প্রয়াণ-পথিক চিল ভেসে যায় মেলিয়া পাখা।
বাগাল* বালক সাথে ল'য়ে ফেরে শীর্ণ গো-মেষ-মহিষ দলে,
শুঁড়ির দোকানে ভগ্নপাঁজর মজুর চাষীর হল্লা চলে।

একদিন বলি কেমনে হ'লো এ নিত্যনীতির ব্যতিক্রম,
কেমনে টুটিল নিঠুর বিধির মিনতি-বধির ক্রূর নিয়ম।
সেদিন ধরণী-ধমনী-শোণিত-প্রবাহ থমকি রুধিছে গতি

* রাখাল

চিল টেনে গেছে বুকভাঙা শিষ ছন্দবিহীন ছিন্নযতি,
সুরার আসরে উল্লাস নাই মলিন হয়েছে দিনের আলো,
ধরণেরণ‡ খরা ঝিমায়ে পড়িল অকাল দেয়ার পরশে কালো।

কাজল ঘনিমা পশ্চিম হ'তে আকাশ-সাগর হতেছে পার,
আলোক-তরীর পক্ষ গুটায়ে তপন কাটিছে ডুবসাঁতার।
মেঘাঙ্গনারা আসেনি ক'‘তাই গাহিয়া সান্ধ্যপূজার গীতা,
কনক-আঁচল-কণ্ঠ-লগনা অস্তসবিতৃা আরতিরতা।
নীরব হয়েছে সাঁওতালি বাঁশি বাউড়ি ছেলের বন্য গান,
সৃজন-আশার আবেশব্যথায় বন্ধ্যা ধরার ছুঁলিল প্রাণ।

বিহারীনাথের বক্ষ বেড়িয়া দীপ্র অনল-কণ্ঠী জ্বালা,
ধূম্রকুটিল শিখায় শিখর সর্পিল জটা হয়েছে আলা,
নৃত্যমাতাল চরণ দোলয়ে নেমেছে রাত্রি সর্ব্বনাশী,
এলায়ে দিয়েছে গহন দীঘল কৃষ্ণ চিকণ চিকুর-রাশি,
অট্টহাসিতে শিহরি' ধরায় বিছুরি' তড়িৎ-অগ্নিবাণ
ঠিকরি' ঠিকরি' গিরির গাত্রে করালো তাহারে আলোকস্নান।

সপ্ততুরগে আবরি' হোথায় লক্ষ মেঘের সোয়ারদল,
প্রভঞ্জনের লক্ষ প্রহরী ধেয়ে এল যেন জোয়ারজল।
তূর্যনিনাদে বিদারি' মরুৎ পাঠালো বার্তা মর্ত্যপথে,
ধূলির কুণ্ড ধারায়-ধারায় উড়িল ঘূর্ণীবায়ুর রথে,
কাঁপিল বসুধা সঙ্গমকামা ঝড়ের অঙ্কে অঙ্গ রাখি',
নিলাজ নারীর মৈথুন-লীলা হেরিয়া বিশ্ব মুদিল আঁখি।

পঞ্চকোট ও শুশুনিয়াকুট পৃথ্বীবালার স্তনযুগল,
বক্ষে চাপিয়া ঝাঁপায়ে পড়িল বিশ্বলালসা ভাঙি' আগল।

‡ দুপুরের

রমণমত্ত অঙ্গ নিঙাড়ি' তরল কামনা ঝরিল ধারে
মদির-অলস পুলক-স্বপ্ন বিবশা তন্বী জঠরপারে,
কামিনী-কায়ায় মন্থন করি' তুলিল নিকষ ফেলিল সুধা,
পুরুষ-পরশ-উর্ম্মি-আহতা বসুধা মিটালো যৌন ক্ষুধা।

বিলাস-বাসর পোহাবে যখন উদিবে তপন পূরব-পটে,
হানিবে ঈর্ষা-জ্বলদ্-নয়ন রমণ-পীড়িত ও-দেহতটে,
রজতধবল চূর্ণ অনল ছুঁড়িবে তুলিয়া বজ্রমুঠি
বঞ্চিত বুকে সিঞ্চিত রস দু হাত ভরিয়া লইবে লুঠি',
শুকাবে সজল চোখের শিশির জাগিবে আবার তপ্ত তৃষা
শ্বসিয়া ফিরিবে সৃষ্টিপাগল শূন্যে শূন্যে হারায়ে দিশা।

এমনি করিয়া নিখিল প্রকৃতি পৃথিবীর সাথে করিছে রতি,
এমনি করিয়া খরায় ঝরায় দহন প্লাবন চলিছে নিতি।
কিন্তু কে কবে কি শাপে তাহারে করিল এমন ভাগ্যহত,
সৃজন-বীজাণু শ্যামল আভায় হতেছে না কেন অঙ্কুরিত।
পাষাণ-বালুর স্তূপের নিম্নে নাই কি কোথাও মাটির মোহ,
যুগ যুগ বাহি' বহিবে কেমনে কঠোর শাস্তি এ-দুঃসহ ?

সংযম

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর
বাড়াবাড়ি ভালোবাসা, সব দোষ মোর।

আতিশয্য বৃথা, অশোভন।
ওথেলোর হিংসুটে মন
পাওলোর প্রণয়-প্রলাপ—

বাতাসের প্রবল প্রতাপ
সাগরের নগ্ন বেসরম
সবুজের চিক্কণ নরম—
সবার ওপরে টেনে দাও আবরণ
মরণ তো অতিকৃতি, অশ্লীল জীবন।

তাই ভালো। সেতার বাজাই
দু' হাতের প্রয়োজন নাই।
ঝঙ্কার ছেড়ে দেবো চিকারীর কাজ
নাই হোলো কাফী ঠাটে বাহারের সাজ।
শুধু কড়ি নিখাদে
কোমলতা-বিবাদে
ফোটাবো সুরের রূপ ফরমাস-মত
তখন তারিফ কোরো—হাত কী সংযত!

জমে ওঠে নিঃশ্বাস
চেপে ধরো উচ্ছ্বাস।
চাকা ঘোরে ঘর্ঘর, নাহিক উত্তাপ
মসৃণ তৈলাক্ত হোক্‌ মোদের আলাপ।

প্রস্তাব

সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রভু, যদি বলো, অমুক রাজার সাথে লড়াই।
কোন দ্বিরুক্তি করবো না। নেবো তীরধনুক।
এম্‌নি বেকার। মৃত্যুকে ভয় করি থোড়াই—
দেহ না চ'ল্‌লে, চ'ল্‌বে তোমার কড়া চাবুক।

হায়রে আমরা! মুক্ত আকাশ ঘর-বাহির।
হে প্রভু, তুমিই শেখালে, পৃথিবী মায়া কেবল—
তাইতো আজকে মন্ত্র নিয়েছি উপবাসীর।
ফলে নেই লোভ! তোমার গোলায় তুলি ফসল।

হে সওদাগর,—সিপাই, সান্ত্রী সব তোমার।
দয়া ক'রে শুধু মহামানবের বুলি ছড়াও—
তারপরে, প্রভু, বিধির করুণা আছে অপার।
জনগণ-মতে বিধিনিষেধের বেড়ি পরাও।

অস্ত্র মেলেনি এতদিন। তাই ভেঁজেছি তান।
অভ্যাস ছিলো তীরধনুকের, ছেলেবেলায়।
শত্রুপক্ষ যদি আচম্‌কা ছোঁড়ে কামান—
বল্‌বো, বৎস! সভ্যতা যেন থাকে বজায়।

চোখ বুজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাবো কান॥

বিরতি

সমর সেন

ধূর্ত দূত পিছু নেয়;
বর্ণহীন বণিক্‌-নগরে
ঘরে ঘরে হানা দিয়ে ফেরে
দুর্বার প্রহরী।

কালো জলে ঢেউ তোলো,
কী সহজ মসৃণ শরীর!
ক্লান্ত চোখে নীল রং আনো,
এসো করো স্নান নবধারাজলে।

উচ্ছিষ্ট নিয়ে ভিখিরী, কুকুরে ঝগড়া।
ইতস্তত মেঘ দেখে
উদ্যত স্তম্ভের আড়ালে এখনো দাঁড়াও,
চোখের সামনে সোনালি আলোয়
অবিশ্রাম ধূলিকণা
দীর্ঘরেখায় আপনমনে নামে,
বর্ণহীন বর্শা কার।
অন্তিম দূর, খরশব্দ সুর,
চক্রপথে পৃথিবী ঘোরে আকাশমণ্ডলে,
মুখে মুখে কী গান কালো হাওয়ায় আসে।

বিরহ

বুদ্ধদেব বসু

ব'হে যায় বিরহের নদী।
যত দূর দেখা যায়, দিগন্ত-অবধি
জল, শুধু জল।
আবর্তিত, উন্মথিত, ফেনিল, উচ্ছল
কালের করাল স্রোত হতাশার পাকে এঁকে-বেঁকে
যায়, ব'য়ে যায়। হত্যাকারী ফণিমনসায়
আচ্ছন্ন এ-তীর। এয়োতির সিন্দুর এখানে
রক্ত হ'য়ে ঝরে। জীবনের কানে-কানে
কঙ্কালেরা চুপি-চুপি কথা কয়; যায়
ঝ'রে যায় জীবনযৌবন;
হৃদয়ে বসন্তবন
ধূলায় বিলীন হ'লো। পিঙ্গল পিশাচ-আলো

মুমূর্ষুর প্রলাপের মতো ইতস্তত
আকাশে প্রান্তরে
অন্ধকারে উচ্চকিত করে।
রাত্রি আসে আকাশে অরণ্যে জলে; জল-কলকলে,
বাতাসের অন্তিম নিঃস্বনে
শোনা যায় নরকের রলরোল, মড়কের লোলজিহ্ব অট্টহাসি;
সর্বনাশী
অতল তিমির নামে, এ-কবন্ধ আলো তারি দূতী।
অন্ধকারে কেঁদে মরে রক্তাক্ত প্রসূতি
সন্তানের মূর্তি দেখে। অবশেষে
মৃত্যুরে সে
মৃত্যুরে কি জন্ম দিলো দীর্ণ হ'য়ে প্রসবব্যথায়!

কোথায়, কোথায়
তুমি, হে প্রিয়, হে প্রিয়তম?
সময়ের সঙ্গমলীলায়, অত্যাচারী তরঙ্গের তালে-তালে
হত্যাকারী অন্ধকারে তুমিও কি তুমিও লুকালে?
এ-কুটিল কালো জলে নেচে চলে
ফণা তুলে দম্ভিল, সর্পিল ফেনা,
আকাশে আতঙ্ক কাঁপে। বাঁচে না, বাঁচে না
এ-জীবন তোমারে হারায়ে
হে প্রিয়, হে প্রিয়তম। দাও, দেখা দাও।
তোমার সন্ধানে ফিরি দু' হাত বাড়ায়ে
অরণ্যে, আকাশে, জলে, পর্বতচূড়ায়,
অগ্নিগিরি-উদ্গীরিত লাভার কর্দমে
পৃথিবীর ধাতব-উত্তপ্ত গর্ভে, গন্ধক-স্ফুরিত
পাতালে; তোমারে খুঁজি উন্মত্ত মৃত্যুর

শাণিত কুক্কুর-দন্তে ; বিষবাষ্পে দুর্গন্ধি, আবিল
অন্ধকারে ; নির্বীজ পাষাণে ; প্রান্তরের
অকর্ষিত শূন্যতায়, সর্বঘ্ন হিংসার
লেলিহান ধ্বংসে ; এই বন্ধ্যা ফণিমনসার
তীরেও তোমারে খুঁজি,
হে প্রিয়, হে প্রিয়তম ; ডাকি তোমারেই
নরকের রোলরোল ভেদ ক'রে, প্রলয়ের জল-কলকলে
তোমারই আশ্বাস যেন শুনি। কোথায়, কোথায় তুমি ?
রাত্রি নামে, পৃথিবীর চিরপ্রসূতির
কান্না শোনা যায় ; আচ্ছন্ন দু'তীর
দুর্গন্ধি মৃত্যুর ধূমে ; ব'য়ে চলে অবিরল কাল
হতাশার পাকে-পাকে এঁকে-বেঁকে। এ-তিমির
তোমারই বিরহ, প্রিয়, এ-আশার দুঃসাহসে
আছি ব'সে,
কঙ্কাল-বেষ্টিত, পীত-লোহিত সন্ধ্যায়।
দূরে শোনা যায়
গন্ধকের বিস্ফোরণ, অগ্নিগিরি-উদ্গীরিত লাভা
এঁকেছে বীভৎস আভা
আকাশের পিঙ্গল ললাটে। কোথায়, কোথায় তুমি ?
এলো, ওরা এলো ! পৃথিবীতে মৃতের, রিক্তের
ছিন্ন-অঙ্গ কবন্ধের ভিড়, অপুত্রীর
অভিশাপ, অকর্ষিত প্রান্তরের নিঃসীম শূন্যতা।
হে প্রিয়, কোথায় তুমি ?
কঙ্কালের দীর্ঘশ্বাসে শুনি
নেই, তুমি নেই।
জ্বলন্ত লাভার
ভীষণ অক্ষর বার-বার
আকাশে, অরণ্যে, জলে লিখে যায় অন্তিম হতাশা—
সর্বশেষ আশা—
নেই, তুমি নেই।

বহুব্রীহি

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

চূর্ণপক্ষ
ছিন্ন ভিন্ন স্বর্ণ বিহঙ্গম
রৌদ্রদীপ্ত দিনগুলি মোর।
কুৎসিত ও কণ্টকিত সরীসৃপ যেন,
রাত্রির কঠিন স্তব্ধ প্রাচীরের গায়ে
ভয়গুলি ফেরে।
কালকে দুর্মুখ চিঠি পেয়েছি তোমার ;
শেষ ছত্র :
লুব্ধ-চক্ষু-লেহ্য এই নারীদেহ হল অস্তমিত।

ক্লিওপেট্রা শালীনতা
মদদৃপ্ত চোখে মুখে দেহে,
আঙুলের আরক্তিম নখরচূড়ায়—
জটিল খোঁপায়।
শীর্ণ-স্নায়ু আলোকের শিখা
অগ্নিপ্রভ ওষ্ঠপুট যামিনী জাগর
নিভে যায় ঝড়ের ফুৎকারে।

এটা জানো ঠিক
আমিও ত জানি,
যদিও গভীর রাত্রে ট্যাক্সি থেকে নামি
স্খলিত চরণে,
মাত্রাশূন্য উচ্চারণ ট'লে ট'লে ফেরে
মন হতে মুখে—
সভ্যভাবে জ্বেলে' দেবে আলো

নিষ্প্রশ্ন নির্ব্বাক চোখে সুধাবে আমায়—
কুমারটুলির কোনো নিষ্ঠুর প্রতিমা যেন
সার্ব্বজনীন পূজাগৃহে—
খাবে কি? খাবার আছে ঢাকা ঐ কোনে;
দরকার থাকে যদি ডেকো, আমি চলি—
অর্গলের ঘজ্রাঘাত কক্ষান্তরে শুনি।
এইরূপই চলে,
জীর্ণ সমাজের বুকে রাত্রি আর দিন।

* * *

কঞ্চুকীর দিন গতপ্রায়।
মসৃণ এ স্বৈরাচারে
নূপুর-শিঞ্জন-স্তব্ধ অন্তঃপুর ব্রীড়ালাস্য-হীন।
সুরভি নিশ্বাস আজ দিগন্তে বিলীন।
সহস্র দিনের চেনা এ শহর অন্তঃসারহীন
গজভুক্ত কপিথের মত।

* * * *

একশো পঁয়ত্রিশ নং বনছায়াবীথি—
অবলোকিতেশ্বর
থাকে। বসু, মৈত্র, সেন নয়,
শুধু অবলোকিতেশ্বর
অবিনশ্বর। এক নয়, আছে তারা।
রাজকীয়, নাটকীয়, পরকীয় পোষাকের ভারে
ভারবাহী তোলে উচ্চ রব।
বাৎস্যায়নও পড়ে রাত জেগে
সানাই-বিক্ষিপ্ত মনে।
সবুজ হৃদয় দীর্ঘ হল যে উতল
মেঘপক্ষ তারিখের ঘন যাতায়াতে।

ফাল্গুন, জ্যৈষ্ঠ, মাঘ, বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণের—
নাঃ মাইরি,
এহেন দামড়াবাজি আর কত দিন—
মার্কস্ পড়ে এবং বোঝে না।
এঙ্গেল্স্—অ্যান্টিড্যুরিং—
মাথার দিব্যি আছে, পড়তেই হবে।
আর একটু সাহিত্যিক জীবন যাপন
দায়িত্ব-স্বামিত্বহীন রিরংসার বেগে।
অ্যাল্ডিংটন বলে—রিচার্ড না পল্?—
মূল-মূল্যহীন হয়ে থাকাই ত সার;
মিস্ গ্রিফিথ্স্ও বলে তাই
মাতিসের চেয়ে, অগষ্টস্ জনই কাম্য।
বেশ লোক তারা—
মুঠি মুঠি খুসী নিয়ে খেলা করে, রুমালেতে মাখে
মনে, মুখে, চোখে। আর সাইবিলিউস্—
ক্লক্ সিম্ফনি আর ডন্ কুইক্সোট,
বাখ্ না ফৈয়াজ খাঁ?—
দোহাই যামিনী রায়
আপনিই অন্তরায়
এ জটিল পথে।
আপনার ও সুগভীর দৃঢ়বদ্ধ মূলে
যা করেন তা-ই সাজে।
আপনার বলিষ্ঠ তুলি যেন বজ্র হানে
মসৃণ ও কৃশকায় অগভীর মনে।
তবু,—তবু অবিনশ্বর
অবলোকিতেশ্বর,
দারুচিনি বনছায়া বীথি।

রৌদ্রের ফলকে দীর্ণ মেঘবর্ণ ত্বক,
হে আকাশ, প্রখর আকাশ!
স্বর্ণ কুম্ভে নবতম কামনা উচ্ছল।
তোমারে পেয়েছি আর
আমারে পেয়েছি আরবার
আকাশের নীলতম চিত্তের মাঝে,
স্বর্ণপ্রভ চিল,
শ্রেণীহীন, বেণীহীন জীবনে আমার।
অর্থ-দুঃশাসিত পৃথ্বী,
তবু, ফেলে যাব আমি কোথা!
কর্কশ নিশ্বাস ছাড়ি ঘর্ম্মপ্লুত ট্রামে বাসে ফেরা,
অনিচ্ছায় বহু চোখে চোখ মেলে রাখা—
জ্যামিতিক সাহিত্যিক ভিড়ে।
নামের এ রাজসূয় যজ্ঞক্ষেত্রে ঘুরি,
একলাই ঘুরি
নির্লোম ও ঘৃতপক্ক।
অজর প্রাণের বিম্ব কায়াবান মুকুরেই দেখি
কাতারে কাতারে নড়ে পথের দুধারে॥

অমাবস্যা

হুমায়ুন কবির

অমাবস্যায় ছেয়েছে সকল ধরা
দিকদিগন্ত নিবিড় তিমির ভরা।
অন্ধকারেরর বিপুল বন্যাস্রোতে
ভেসে গেল গ্রহতারা নীলাকাশ হ'তে।
রবিশশী লাজে কোথায় লুকাস ত্বরা?

গহন কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদামে
সব বিচ্ছেদ ঘুচে দক্ষিণে বামে।
মুক্ত আকাশে মানুষের বিচরণ,
স্বপ্ন-ভুবনে অনাগত জাগরণ,—
জমাট আঁধারে সব জিজ্ঞাসা থামে।

প্রথম উষায় দূর পশ্চিম পানে
উদ্দাম হিয়া চলে কার অভিযানে?
মধ্যদিনের প্রখর রবির করে
ছায়াহীন পথে তপ্ত ধূলির পরে,—
ভর সন্ধ্যায় বিশ্রাম নাহি জানে।

সব সন্ধান অন্ধকারের কালো
গভীর অতলে হারানো—সেই কি ভালো?
জমাট আঁধারে নাহি ছেদ, নাহি ফাঁক,
—আলোর কাকলী আতঙ্কে নির্ব্বাক—
বিভ্রান্ত হিয়া তিমিরে দিক হারালো?

অমাবস্যার নিবিড় কবরী রাশি
আকাশের কূল ছাপায়ে পড়িছে আসি।
সেই বন্যার উদ্দাম গতিবেগে
আদিম আঁধার আবার উঠিছে জেগে
দিকদিগন্ত বিস্মৃতিতলে গ্রাসি।

চীন-জাপান

সুরেশচন্দ্র সরকার

চীন-জাপানের যুদ্ধের খবর পড়ি রোজ।
সন্ধ্যার টেলিগ্রামে উল্লম্ফনে সংবাদ এগোয়।
যদিও কেরাণী, তবু ভাবি কোথা এর শেষ!

বাবা ছিলেন অধ্যাপক, শিল্পরসে অকেজো মানুষ।
তাঁর পড়বার ঘরে, মনে পড়ে, ঘুরে ঘুরে দেখতুম,
কাচের আলমারি-বন্ধ, পতঙ্গ-হরফে দাগা,
পুরোনো বিদেশী পট:
সরু সরু, কালো ডাল-মেলা গাছ;
তলায় চলেছে নদী, নিস্তরঙ্গ জল;
পরপারে শিশির মাখানো ঘাসে গুটিকতো বেলেহাঁস;
ভোর হ'বে, আকাশে আভাস।

দেখতুম পুরোনো পুতুল, অপরূপ গাছের তলায়
অচেনা পাখিকে ফল দেয়;
মুখে হাসি, সরু চোখ আদরে তির্যক্।

ভাবতুম, কোথায় জাপান, কোথায় চীন!
যেখানে মানুষ খালি ছবি আঁকে, পুতুল বানায়,
আর মিষ্টি হেসে খেতে দেয় সবুজ চা,
কারুকরা হাতপাখার ধীরে ধীরে হাওয়া খায়!

সে সব পুরোনো দিন বহুদিন পিছে ফেলে
আপিসে কলম পিষি।
তবু মাঝে মাঝে ভাবি সমস্ত স্বপ্নের
সমস্ত অবসরের শান্ত গান, সকরুণ ছবি,
কখনো কি ক্ষুধার মলিন হাতে ম্লান হবে,
ডুবে যাবে বণিকের মৃত্যুবর্ষী পুষ্পক-মর্মরে,
ধর্মনিষ্ঠ চরকার ঘর্ঘরে!

শারদীয় ভাব

অজিত দত্ত

দু' হাতে যতটা ধরে, অতিরিক্ত বেশী কিছু নয়,
কিছুটা আহার্য বস্তু, কিম্বা বড় জোর কিছু টাকা,
কিম্বা ঢাল তরোয়াল, বোমা আর সেল্যুটে না হয়
দু' হাত আবদ্ধ থাক, তবু বুঝি কারে বলে থাকা।
কিন্তু দৈব দুর্বিপাকে শূন্যহস্ত, বটুয়াটি ফাঁকা,
মস্তিষ্কও তথৈবচ; একমাত্র আছে বরাভয়
দানযোগ্য; হেতু তা'র—শূন্য হাতে থাকে সেটা আঁকা;
দেখিতেছি উক্ত বস্তু একমাত্র রয়েছে অক্ষয়।

একমাত্র আশা তুমি, উগ্রচণ্ডী হে কেরানি-প্রিয়া,
প্রেমভাষণের, এসো, অপব্যয় কিছু হোক্ আজ,
বাড়ন্ত ভাঁড়ারে যাক্ বসানো বিশাল নিমন্ত্রণ;
পুষ্পবৃষ্টি করিবেন উকিল ও অধ্যাপকগণ
যেহেতু অধুনা মাত্র তাঁহাদেরই আশ্চর্য সে কাজ
প্রাংশু লভ্য যার বলে নাস্তি বস্তু পঞ্চজনে দিয়া॥

ট্র্যাজিডি

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার ঘরের ঘড়িটা শব্দ ক'রে চ'লেছে,
সময়ের সমুদ্রে ওর দাঁড় পড়ছে যেন সমান তালে।
পশ্চিম দিকের জান্‌লাটা খোলা,
একদল কী পাখী উড়ে গেল।

দেখ্‌লাম : নির্ঝর ধারার ঝর্ঝর শব্দের নীচে
দাঁড়িয়ে আছো তুমি,
তোমার ঠোঁটে কাঁপচে পূর্ণিমা রাত্রির—
পূর্ণ ইতিহাস !
বাতাসে বাতাসে কেবলি উড়ে পড়চে তোমার
এলায়িত অলক গুচ্ছ ;
আর,
মাথার উপরে ভেসে চ'লেছে, হাল্কা, হয়তো নরম মেঘ !

দেখ্‌লাম পিরামিডের চূড়োয় প'ড়েছে
চন্দ্রালোক ;
ঝক্‌ঝক্ করছে তার শীর্ষদেশ
ধূ ধূ করছে বিস্তীর্ণ প্রান্তরভূমি,
তুমি দাঁড়িয়ে আছো !
অনেক রাত।—আকাশে অনেক তারা।
আর
মিশরের নির্জন ভূমিখণ্ডে দাঁড়িয়ে
আমি অবাক হ'য়ে দেখ্‌চি,
পরণে তোমার এ কী বেশ !
ঈরাণী নাকি তুমি ?

হঠাৎ ভেঙে প'ড়লো পিরামিডের চূড়ো,
নেমে গেল ঝর্ণার ঝর্ঝর বারিধারা,
তুমি আসোনি,
তুমি আস্‌বে না।
—এই শব্দ-মুখর সময়-সমুদ্রের তট-সীমায়
দাঁড়িয়ে
আমিই বা কেমন ক'রে বলি : তুমি এসো !

দিনশেষে

মিহিরকুমার বসু

এইখানে বস তবে, হয়ত এখনি সন্ধ্যা হবে,
জ্বলন্ত মেঘের স্রোতে হয়ত নামিবে অন্ধকার,
তার মাঝে কোনো চিহ্ন রহিবে না তোমার আমার,
অনন্ত বিশ্বের মাঝে কখন হারায়ে যাব সবে।
তোমার অলক বহি' গলিত সন্ধ্যার অগ্নি ঝরে,
রক্ত করে খরতর ; এস এই গাছের ছায়ায়।
(বনের বিরহ যেন এইখানে আলসে লুটায়ে)
দুইজনে পাশাপাশি স্তব্ধ হ'য়ে বসি ক্ষণতরে।

তোমার পিছনে হের তৃতীয়ার কৃশকায়া চাঁদ
স্থিরপদে উঠে এলো, শীর্ণস্রোত তটিনীর ধ্বনি
মদির সুরের ঘায়ে কেটে কেটে চলেছে ধমনী,
তারা কি জেনেছে আজি আমাদের গোপন সংবাদ ?
গলিত সন্ধ্যায় এই মৃত্যুহীন গাছের ছায়ায়
অতল সৌন্দর্য্য তব কী সন্ধান দিল যে আমায় !

নিশীথে

মিহিরকুমার বসু

এই রাত্রে কারো রক্তে এলো নাকি চঞ্চল বলাকা ?
সমুদ্রের প্রসারতা এ রজনী দিল কার বুকে,
শিশুর চাঞ্চল্য এলো কার মাঝে অশান্ত কৌতুকে,
কাহার নয়ন আজি মহাকাশে মেলিয়াছে পাখা ?
পুষ্পগন্ধে রাত্রি আজ দিশাহারা মৌমাছির মত
আপন গুঞ্জন-মুগ্ধ, সেই মৃদু গীতধ্বনি তার
আমার ক্লান্তিরে ঘিরি চক্রাকারে ঘোরে অনিবার,
জীবনের স্তব্ধতারে সুরে সুরে করিছে বিক্ষত।

যে জীর্ণ মুহূর্ত্তগুলি মনের দুর্গম দুর্গদ্বারে
আঘাত করিয়া নিজে ঝ'রে গেছে পথের ধূলায়,
স্পন্দমান রাত্রি আজ তার ভস্মরাশি পানে চায়,
মৃতের সমাধিতলে সন্ধান করিছে যেন কারে।
আমার উচ্ছল রক্তে কান্না শুনি কোন বিরহীর,
—সূর্য্যের দুঃসহ দাহ অন্ধকারে স্পন্দিত রাত্রির।

পাথর-কুমারী

মণীন্দ্র রায়

চাহে নাই বেদনার দান
মুদিত মাধুর্য্য তার,
শূন্য, নিরুদ্দেশ।
জীবনের আতুর আঘ্রাণ
হানে তারে ধূসর প্রহার,
নীরক্ত আবেশ।

দেখ তার স্মৃতির পাহাড়
স্তব্ধতায় হ'য়ে গেছে নীল,
মৃত্যুসম হিম।
স্বপনের ভীরু উপহার
হ'য়ে আসে নয়নে নিমীল,
উদাস অসীম।

আদিগন্ত বালুকার ঢেউ,
রৌদ্রে ঝরে ঝিঁঝিঁর মতন।—
বিবর্ণ বিলাপ।
তারি মাঝে জানে না তা কেউ,
শতাব্দীর কুমারী রতন
লভে অভিশাপ।

পাথরের সুরভির শ্বাস
লভিয়াছে মূর্ত্তি বেদনার ;
কুমারীর মায়া।
উদাসীন কালের বিলাস
রেখে গেছে এই পুরস্কার,
অনাঘ্রাত ছায়া।

আড় হ'য়ে বালুকার স্তূপে
দিগন্তে চাহিয়া প'ড়ে আছে
ভগ্ন-জানু দেহ।
দিবসের রৌদ্র আসে চুপে ;
প্রগাঢ় আঁধার তার পাছে,—
শিশিরের স্নেহ।

কালের প্রবাহ ক্ষুরধার।
বছরের স্রোত বেয়ে চলে
শতাব্দী সাগরে।
পাথরের মূর্ত্তি অবিকার,—
প'ড়ে আছে আকাশের তলে,
বালুকার 'পরে।

বৃন্দাবন

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ষ্টেশনের পাশে কাপড়ের বস্তায় বসে
একটা চীনে সবুজ কলা খায়
ধূলোটে দিগন্তের বুকে বাব্‌লার ঝাড় বেঁধা।
আর মাঝে-মাঝে ভাঙা একায়
হঠাৎ তীর্থযাত্রীর ঝলকানি।

সন্ধেয় কর্ত্তাভজার দলে চক্করে চক্করে
আদিরসের চর্চ্চা :
শশ্মান-যাত্রীর সংকীর্ত্তনে মুখর হয় নগর
আর মন্দিরে অর্থস্ফীত সুরেন্দ্র সিংহ
আরতির বিলাস।

এখানে কি কোনোদিন নেমেছিল মাহ ভাদর ?
এই রুক্ষ দিগন্ত কি কোনোদিন আবছা হবে শ্রাবণের সহস্র ধারায় ?

মালগাড়ীর শ্লথ গতিতে রাত গড়িয়ে আসে,
অন্ধকারের বুকে পথের আলোর ক্ষত।

দিবাঘুম

হরপ্রসাদ মিত্র

দেখিলাম বহুদূর পাহাড়ের নীচে
কী নিথর বনছায়া কাঁপে !
দুপুর তো যায়।...
কে ঘুমায় ?
—মণিমালা ঝাঁয়।

কবিতা
কার্তিক, ১৩৪৬

কে বা জানে এলো কোথা স্মরণীয় ঝড় !
দেহ কা'র কামনায় কাঁপে থর-থর !

দিন হ'লো রমণীয়, আকাশ কী নীল !
হাতে-হাতে ছোঁয়া লাগে, মনে-মনে মিল।

দেখিলাম কাঁপে ছায়া পাহাড়ের নীচে।

*   *   *

তির্যক নামে রোদ রসা রোডে,—পিছে ॥

চিন্তাহরণের চালাকি

পরিমল রায়

জানেন না কি, মস্ত গায়ক আমাদের এই চিন্তাহরণ :
দেশ জুড়ে' তা'র ছড়িয়ে গেছে নাম,
রেকর্ডগুলো কাট্‌ছে অবিশ্রাম,
কণ্ঠে তাহার, সবাই বলে, সত্যিকারের মধুক্ষরণ।

আসল কথা, মগজে তা'র ফন্দীখানা লক্ষ্মীছাড়া,
পয়োধরা রাধার রাতের লীলা
—ধর্ম্ম-কথার মস্ত যা অছিলা—
করুণ সুরে আবেশ-ভরে গায় সে অতি আত্মহারা!

লোকে বলে, কী মিঠে গান! আসরে তার উচ্চ আসন,
বল্‌বে না কি? মিথ্যে কি নয় তর্ক করা?
পয়োধরা কোথায় এমন দিচ্ছে ধরা?
শ্রীরাধিকার অঙ্গে হেন পীনোন্নত স্তবভাষণ?

ডক্

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

দিগন্তের ক্লান্ত সূর্য্য নির্ব্বাসিত দিকচক্রবালে,
জাহাজের ডকে যতো প্রত্যাগত মাস্তুলের ভিড়
বিবর্ণ তেলের গন্ধে ভারাক্রান্ত দক্ষিণ সমীর,
অদ্ভুত স্তব্ধতা নামে নিরপেক্ষ এই রাত্রিকালে।
নিস্তব্ধ জলের বুকে ধীরগামী দাঁড়ের আভাস
অন্ধকারে আলো জ্বলে অগ্নিচক্ষু যেন দানবের।
স্তূপীকৃত পিপাগুলি একপ্রান্তে রয়েছে ডকের,
পাথরের মতো স্থির ঊর্দ্ধশূন্যে অনন্ত আকাশ।

ভাপসা তেলের গন্ধে জমে ওঠে ডকে অন্ধকার,
ঠোঁটে বিড়ি জ্বেলে বসে' মধ্যরাত্রে খালাসির দল।
ভাঁটা শেষে ক্রমে আসে স্থির জলে উতলা জোয়ার,
নক্ষত্রের শান্ত ছায়া জোয়ারের ঘায়ে টলমল।
সারি-সারি আলোগুলি অন্ধকারে জ্বলিতেছে লাল,
বিনিদ্র দৈত্যের মতো স্তব্ধ ডকে জাগে মহাকাল।

শাদা মেঘ

নিশিকান্ত

কাহার নিশ্বাসের সাথে ভাস্‌লো তোমার ভেলা,
ও শাদা মেঘ, দুপুরবেলার মেঘ?
কার মানসের মরাল-সম মূর্ত্ত তোমার খেলা,
ও শাদা মেঘ, দুপুরবেলার মেঘ?
স্রোতে ভাসা ফুলের মত ভেসে
কোথা হতে এলে তুমি, তরী তোমার
থাম্‌বে কোথায় শেষে?

একটি শুভ্রসুরের মত তোমার প্রকাশখানি,
ও শাদা মেঘ! দুপুরবেলার মেঘ!
নীলাকাশের পরপারের কোন অচলের বাণী,
ও শাদা মেঘ! দুপুরবেলার মেঘ!
কোন সাগরের স্বচ্ছ গভীরতা
তোমার লেখায় উঠলো ফুটে!—কোন্ নিথরের
সুপ্তির মৌনতা!

তুমি কাহার ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন-সম চলো,
ও শাদা মেঘ, দুপুরবেলার মেঘ?
কোন্ পরাণের নির্মলতার শুক্ল শিখায় জ্বলো,
ও শাদা মেঘ, দুপুরবেলার মেঘ?
সঙ্গীহারা তোমার চলার মাঝে
পলে পলে কোন্ একাকীর একতারাটির
মর্ম-ধ্বনি বাজে?

তুমি আমায় লও তুলে আজ তোমার তরণীতে
ও শাদা মেঘ! দুপুরবেলার মেঘ!
মাঝি তোমার মিশায়ে থাক্ আমার সুরে গীতে,
ও শাদা মেঘ! দুপুরবেলার মেঘ!
মরাল-সম মেলব আমি পাখা,
অচিন্-বনের ফুলের মত আমার মনের
বিকাশ হবে আঁকা।—

স্বপন-সম ভাসিয়ে নিয়ে চল্‌ব স্বপনীরে,
ও শাদা মেঘ! দুপুরবেলার মেঘ!
জ্বালিয়ে দেবো অতল ঘুমের রতন-শিখাটিরে,
ও শাদা মেঘ! দুপুরবেলার মেঘ!
সন্ধ্যাবেলার আকুল দিগ্বালাকে
করবো বরণ চিরন্তনের নীরব—গভীর,
প্রেমের রক্ত-রাগে!

মহাকাব্যের পরিশিষ্ট

প্রবোধ ঘোষ

রক্তে তোমার ধ্বংসের বীজ বোনা—
তোমাকে বাঁচানো ব্রহ্মারও গুরুভার!
প্রতারণা আর নিজেকে কেন বা করো?
ভালোবাসা আজ দুঃসহ অবিচার।

বিলোল চোখের পুঞ্জিত চারুকলা,
স্তনচূড়া কাঁপে কামনায় থরথরি'—
এ সবে ভুলে' কি সর্বনাশের গাঙে
ভাসাবো হঠাৎ ভবিষ্যতের তরী?

দু'চোখে না হয় ঝরলো দু'ফোঁটা জল—
ছিঁড়ে ফেলে দাও মিলনের ফুলহার।
এখনো সময় রয়েছে, তোমাকে বলি:
ভালোবাসা আজ দুঃসহ অধিকার।

জানো না কি তুমি তোমারি কুটিল দেহ
বেঁধেছে তোমাকে কামনার নাগপাশে?
শুধু সংশয় পাথেয় স্বীকার করি'
ছুটবে কি সারা জীবন রুদ্ধশ্বাসে?

মাথা নীচু করে' ভাব্‌ছো কি এতো, বলো?
আবার নয়ন ভরলো যে লোনা জলে!
প্রেমেরে করেছো সূর্য্য স্বপনাকাশে—
সূর্য্য কখনো নামে কি ভূমণ্ডলে?

বঞ্চিত কতো মদনদাহের রাতে
বারে বারে জেগে উঠেছো স্বপ্নাহত।
বাহুবন্ধন কল্পনা করি' মনে
আপনাকে আর আপনি ভোলাবে কতো।

তাই বলি, শোনো, এখনো সময় আছে,
রচিত প্রণয়কাহিনী এখনো ভোলো।
ঊর্দ্ধে শ্বাসের নীলাকাশ আজো আছে—
এখনো ভাঙো গো ভুলের ভূমণ্ডলও।

ভালোবাসা আজ অতি দুর্বহ ভার—
সর্বনাশের খড়্‌গ তোমাকে হানে।
তুমি ফিরে যাও মরুদ্বীপের পার—
আমি তো চলেছি জ্বলিত মরুর টানে।

দুটি কবিতা

ত্রৈলোক্য বিশ্বাস

(১)

এ বিশ্বের অতিক্রান্ত যাত্রাপথ-রেখা
অতীতের ইতিহাসে হয়ে গেছে লেখা।
বর্তমান
আমার চোখের আগে আছে মূর্তিমান ;
ভবিষ্যৎ
গতির ইঙ্গিতে জাগে স্বপ্নরেখা-বৎ ;
প্রসারিত আছে
অনাদি অনন্ত কাল, কোথা তার শেষ রহিয়াছে
আজো কিছু জানা হয় নাই।

মনে হয়, আজিকার সব কিছু তাই
জল স্থল
তরুলতা পাখী ফুল ফল
আগামীর বিরাট ভূমিকা।

(২)

বেদনার রক্তরাগে ভরে আছে
সন্ধ্যার আকাশ,
কালো-হয়ে-আসা যত সবুজ পল্লব
স্তব্ধ অচঞ্চল ;
শুষ্কপ্রায় পাণ্ডুর পল্লবে শুধু
বেদনার ভাষা
মূর্ছিত হইয়া আছে ; নাহি চঞ্চলতা
নাহি ডাকে পাখী।
দিবাসের চিতাপ্রান্তে সমস্ত প্রকৃতি
শোকেতে আকুল হয়ে আছে মুহ্যমান।
গ্রামান্তে পথের মাঝে যানের ঘর্ঘর
শোকাকুলা স্তব্ধতারে করে অপমান।

খবর

অনুপম গুপ্ত

খবর এল
মৃত্যুর খবর
কারাপ্রাকারের অন্ধকারের
দম্‌কা হাওয়ায়
একে একে প্রদীপ নিভে যাওয়ার খবর,
আর খবর এল
আত্মঅপচয় শক্তিসংহার ব্রতের।

কার্তিক, ১৩৪৬

(মনে পড়ে
অনশন-ক্লিষ্ট বন্দীদের
ক্লান্ত মুখচ্ছবি।
ভাবি—তবু তো
প্রমথেশ-কানন সংবাদ-মুখর
ছাত্রদের অন্তর,
নিতান্ত নিয়মানুক্রমিক
আবার চলে কিছুদিন
কাগজের সম্পাদকের শোকগাথা,
আর কর্নওয়ালিসে সোল্লাস শোভাযাত্রার স্রোত-কল্লোল শোনা যায়
ট্রাম থেকেও নাকি টেনে লোক নামায়
এতোই শোকোন্মাদ।
ক্ষণিক চঞ্চলতার উদ্দীপ্ত জয়গান
এবার জয়যাত্রা সুনিশ্চিত
তবু তো
রেডিও-সংবাদ-বিমোহিত
উল্লসিত প্রাণ।)

আর খবর এল বন্যা দুর্ভিক্ষের
শিশুর অনাহারের
ফাঁপা আন্দোলনের,
প্রেমবিষে জর্জ্জরিত
জোড়া বেঁধে মৃত্যু-বিষ-মধু পানে
চির-তরে জ্বালা নিবারণ
—এও খবর এল।

আর একটি খবর
'বাংলার পাড়াগাঁয়ে শীতের জ্যোৎস্নায়...
কত বালিকাকে নিয়ে গেল বাঘ—জঙ্গলের অন্ধকারে'।
সাংবাদিক রকমারি দিয়েছে খবর।

আত্মকথা

প্রমথ চৌধুরী

কিছুদিন থেকে আমার পরিচিত যুবকের দল আমাকে আমার আত্মকথা লিখ্‌তে অনুরোধ করছেন। এর কারণ আমি অনুমান করতে পারি। আমার দেহ এখন জরাজীর্ণ আর সম্ভবতঃ মনও তাই। ক্রমে সে মন বর্ত্তমান থেকে অনেকটা আলগা হয়ে পড়েছে—আর যার বর্ত্তমান নেই, তার ভবিষ্যতও নেই। এহেন মনে যদি কিছু থাকে ত আছে অতীত। আমি যখন এ পৃথিবীতে অনেকদিন আছি, তখন আমার স্মৃতির টেঁক নিশ্চয়ই ভারি হয়েছে।

তা ছাড়া যুবকদের বিশ্বাস যে, আমার যদি বলবার কিছু থাকে ত আমি তা বলতে পারি। আমার মনের অক্ষর জড়ানো নয়।—সুতরাং আমার স্মৃতির যদি কোনও মূল্য থাকে ত আমি তা' ব্যক্ত করতে পারব। ফলে আমার স্মৃতিলিপি সুপাঠ্য হবে।

কিন্তু আত্মচরিত রচনা করা আমার পক্ষে সুসাধ্য কিনা, আর সে রচনা পাঠকসমাজের মুখরোচক হবে কিনা জানি নে। লোকের বিশ্বাস আমি এ জীবনে বহু লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি—সুতরাং তাঁদের ছবি ত আঁকতে পারব। ফলে ওই portraitগুলিই অতীত সমাজের চিত্র হবে। আমি যদি সমাজের রঙ্গভূমিতে দর্শকই হই, তাহলে কি দেখেছি তা ত বল্‌তে পারব। এ হচ্ছে ইংরেজীতে যাকে বলে recollection, অর্থাৎ স্মৃতির গহ্বর থেকে পুনরুদ্ধারের কথা। মহাত্মা গান্ধী লিখেছেন যে auto-biography লেখা আমাদের দস্তুর নয়, কিন্তু তার পরেই তিনি ছাপার অক্ষরে ১৯০০ পাতা নিজের auto-biography লিখেছেন। এর কারণ তিনি মহাত্মা।

Auto-biography ত দূরের কথা, biography লেখবারও অভ্যেস আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের ছিল না।

রামায়নকে যদি কাব্য হিসেবে না দেখে biography হিসেবে দেখা যায়, তাহলেও রামচরিত্র মানুষের চরিত্রবর্ণনা নয়; বিষ্ণুর অবতারের বর্ণনা। মহাভারতও তাই। নারায়ণ ও নরোত্তমের ইতিকথা। কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং নারায়ণ, আর অর্জ্জুন নরোত্তম। অর্জ্জুন ঠিক মানুষ নন। তাঁর দাদা ভীম ছিলেন পবননন্দন হনুমানের ছোট ভাই, আর অর্জ্জুন

ছিলেন ইন্দ্রদেবের ঔরসপুত্র। সুতরাং তিনি ছিলেন আংশিক দেবতা। মানুষের জীবনচরিত সংস্কৃত কবিরা লেখেন নি। মহাকাব্যের কথা ছেড়ে দিলেও, সংস্কৃত ভাষায় আরও দু'চার খানি জীবনচরিত পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের একাধিক জীবনচরিত আছে। তাদের মধ্যে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত অতুলনীয়। বুদ্ধচরিত চমৎকার কাব্য, তা ছাড়া গৌতম বুদ্ধের জীবনচরিত। এ জীবনও unique, কিন্তু এও দেব চরিত্র।

হর্ষচরিত অবশ্য মানুষের জীবনচরিত। কিন্তু এ পুস্তকে হর্ষের কথা অতি সামান্য। বাণভট্ট তাঁর কৈশোরেরই দু-এক কথা বলেছেন। এই বই পড়ে আমাদের হর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞানের ক্ষুধা মেটে না। এর গালভরা সংস্কৃতই এর প্রধান গুণ।

এখন বাঙলায় আসা যাক্। বাঙলা ভাষায় শ্রীচৈতন্যের বহু জীবনচরিত আছে। এই সব জীবনচরিত কতকটা সত্য আর বেশীর ভাগ কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত।

চৈতন্যের জীবনের কোন্‌টা সত্য, আর কোন্‌টা ভক্তের মন গড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতরা তার বিচার সুরু করেছেন। তাঁরা যদি পূর্ব্বাচার্যদের স্বকপোলকল্পিত সমস্ত কথা বাদ দিতে সক্ষম হন, তাহলে যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, তাকে biography বলা চলে না।

হিন্দু যুগ ও মুসলমান যুগ পেরিয়ে এখন হাল আমলে আসা যাক্।

গত দেড়শ' বৎসরের মধ্যে দেদার বাঙলা বই লেখা হয়েছে, কিন্তু একখানাও biography লেখা হয়নি, যদি প্রতাপ-আদিত্যচরিত বাদ দেওয়া যায়। এ বইয়ে কি আছে জানিনে, কেননা আমি সেটি পড়ি নি—আর কেউ পড়েছেন বলে জানিনে।

ইউরোপে যাঁদের জীবনচরিত লেখা হয়, তাঁদের জুড়ি লোক ইতিমধ্যে বাঙলাতেও জন্মেছে। অন্ততঃ রামমোহন রায় যে বাঙালী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর জীবনচরিত লেখা হয়েছে। কিন্তু সে জীবনচরিত সাহিত্য হিসেবে গণ্য নয়।

ইংরাজী সাহিত্য পড়ে দেবতার বদলে আমরা মানুষের জীবনচরিত রচনা করছি। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র দেবতার জীবন নয়, মানুষের। তাঁর কৃষ্ণ নারায়ণ নন, নরোত্তম। এ-বইকে বলা যায় ecce homo। Mill-এর শিষ্য Seeley যে হিসেবে খৃষ্টের জীবনী লিখেছিলেন, মিলের শিষ্য বঙ্কিমও সেই হিসেবে কৃষ্ণের জীবনী লিখেছেন।

এতক্ষণ যে-সব কথা বললুম তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এইটি দেখানো যে, কারও জীবনচরিত লেখা আমাদের ধাতে নেই—নিজেরও নয়, পরেরও নয়।

মহাত্মা গান্ধী এ নিয়ম ভঙ্গ করে ১৯০০ পাতা বই লিখেছেন। বলা বাহুল্য এ বই সাহিত্য পর্য্যায়ভুক্ত নয়। মহাত্মা গান্ধীর আত্মচরিত জানবার জন্য যাঁদের অদম্য কৌতূহল আছে, তাঁরা এই বই কষ্ট করে পড়বেন। যে-সব বই জোর করে পড়তে হয় তা কাব্য নয়; দর্শন হতে পারে, নীতিশাস্ত্র হতে পারে। যে বইকে একবার ধরলে আর ছাড়া যায় না, তাই একরকম কাব্য।

Biographyকে কাব্য বলায় চমকে উঠবেন না। রামায়ন, মহাভারতকে আমি biography বলতে প্রস্তুত, কিন্তু এ উভয়ই কাব্য—শুধু কাব্য নয়, মহাকাব্য। আমি এ জাতীয় বিলেতি বইয়ের নাম উল্লেখ করলুম না—কেননা তাদের সঙ্গে সকলের পরিচয় নেই। অপর পক্ষে রামচরিত ও কৃষ্ণচরিতের সঙ্গে পরিচয় কার নেই ?

বাঙলা সাহিত্য আত্মচরিতে দরিদ্র। তাহলেও বাঙলায় এ জাতীয় একখানি অতুলনীয় গ্রন্থ আছে,—রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। আমি যখন এ বই প্রথম পড়ি, তখন এর ভাষার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে যাই; সে মোহ আমার আজও কাটেনি। এমন শিষ্ট শান্ত অথচ সকৌতুক ভাষা আর কেউ লিখেছেন বলে জানিনে। এক কথায় জীবনস্মৃতি সাত্ত্বিক গদ্যের একমাত্র নমুনা। জীবনস্মৃতি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আত্মচরিত নয়; তাঁর কবি-প্রতিভার ক্রমবিকাশের আংশিক ইতিহাস।

এ পর্য্যায়ের আর একখানি গ্রন্থ আছে, যা সুখপাঠ্য—কবি নবীনচন্দ্র সেনের আত্মকথা। এ গ্রন্থে কবিবর তাঁর আত্মপ্রকাশ করেননি, করেছেন তাঁর অহংপ্রকাশ। তাঁর স্বকীয় অহং যে একটি বিশিষ্ট ও বিচিত্র অহং, সে বিষয়ে তাঁর মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। তিনি অবশ্য magnifying glass-এর ভিতর দিয়ে নিজের চেহারা দেখেছেন এবং আমাদেরও দেখাতে চেষ্টা করেছেন। সুতরাং এ বই পড়ে আমাদের মজা লাগে, ভালও লাগে।

আমি যদি কখনও আমার আত্মকথা বলি, তাহলে সে উক্তি স্বগতোক্তি হবে না, হবে জনান্তিকে।

কাব্যে অদ্বৈতবাদ

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

বিদেশ, সুতরাং আমাদের দেশে, কাব্য-রচনায় এখন মুক্ত-ছন্দের পদ্ধতি চলেছে। নূতন ও আধা-পুরাতন কাব্য-লেখকেরা এ রীতি ছাড়া অন্য রীতিতে আর বড় কাব্য লিখছেন না। কাব্যের বিষয়-বস্তুতেও একটা মোটামুটি ঐক্য দেখা দিয়েছে, যদিও ঐক্যটা একটু বিরোধাত্মক ঐক্য। অর্থাৎ পূর্ব্ব কবিরা যে সব বস্তুকে তাঁদের কাব্যের বিষয় করেন নি, এবং আপাতদৃষ্টিতে যে সব বস্তু মনে হয় অকিঞ্চিৎকর ও কাব্যের অনুপযোগী তাদেকেই কাব্যের বিষয় করা। কাব্যের ভঙ্গীর মধ্যেও বেশ মিল দেখা যাচ্ছে। ভার্বের রঙীন আলোতে কোনও কিছুকে প্রকাশ করা নয়, সব কিছুকে দেখাতে হবে রংলেশহীন সাদা আলোতে, বরং সম্ভব হ'লে X-রশ্মির আলোকে যাতে দেহকে দেখা যায় কঙ্কাল মূর্ত্তিতে।

কাব্যের এই নূতন ছন্দ, বিষয় ও ভঙ্গীর আবির্ভাবে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। কবিতা রচনার নূতন নূতন ছন্দ যে কবিরা চিরকাল সৃষ্টি ক'রে চলেছেন বদ্ধ ছন্দের বিপুল বৈচিত্র্যই তার প্রমাণ। সব ছন্দই কিছু আদিতে ছিল না, আর একদিনেও আবিষ্কার হয়নি। মুক্ত-ছন্দের প্রচলন যে ছন্দ মিলাবার আয়াস থেকে মুক্তি দিয়ে বহু লোককে কবিতা লেখায় প্রলুব্ধ করেছে যারা অন্যথা ও কাজে হাত দিতো না, এবং তাদের মুক্ত-ছন্দ যে মুক্ত হলেও ছন্দ নয়, সেটা এ নূতন ছন্দের কোনও লাঘব প্রমাণ করে না। ছন্দের কানহীন অকুশলীর হাতে কোন্ ছন্দের না দুর্দ্দশা হয়। শক্তিশালী কবিরা কবিপ্রসিদ্ধিহীন নূতন বস্তুকে কাব্যের বিষয় নিয়তই ক'রে থাকেন। আনন্দবর্দ্ধন হাজার বছর পূর্ব্বে বলেছেন—এমন কোন্ বস্তু আছে কবির প্রতিভা যাতে কাব্যের রস সঞ্চার করতে না পারে। প্রকাশের অভিনব প্রেরণায় নয়, কেবল চমকপ্রদ কিছু বলার উত্তেজনায় যদি কৃশ-কবিত্ব লোকদের অপ্রচলিত বিষয়ে কোমর বেঁধে কাব্য-প্রচেষ্টার ফল হাস্যকর হয় তাতে প্রমাণ হয় না যে কাব্যের বিষয়-বস্তুর গণ্ডী স্থির হয়ে গেছে; নূতন কবিদের তার বাইরে যাবার যো নেই। ও-গণ্ডী যে মায়া মহাকবিদের কাব্য তা চিরকাল প্রমাণ করেছে। নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে বস্তুকে দেখান কাব্যে নূতন রসের সৃষ্টি করা। এ কাজ শ্রেষ্ঠ কবিরা চিরদিন ক'রে আসছেন। আমাদের আলংকারিকেরা যে রসকে বলেছেন ন-রকমের তার পাটিগণিতটা বিবক্ষিত নয়। ওর অর্থ কাব্যের রস অশেষ রকমের, এক রকম নয়। এবং নয় প্রকার রসের মধ্যে তাঁরা

বীভৎস্যকেও গণনা করেছেন। বামন কবিদের সম্পূর্ণ নূতন রসের অমৃত ফলের দিকে ঊর্দ্ধ বাহু অনভিপ্রেত হাস্য ও করুণ রসের সৃষ্টি করলেও অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রসের সৃষ্টিই কাব্যের জগৎকে সমৃদ্ধ করে, তাকে দেয় বৈচিত্র্য।

কিন্তু কাব্যের এই নূতন পদ্ধতির সঙ্গে একটা তত্ত্বও প্রচার হচ্ছে। তার কথা এ নবীন কাব্যের যে নূতনত্ব তা কেবল নূতন নয়, তা চরম। এ কাব্যে যে ছন্দ চলেছে তার আবিষ্কারে পুরাতন সব ছন্দ বাতিল হয়ে গেছে। তারা হয়ে রইল ঐতিহাসিক। প্রকৃত যারা কবি তারা এখন থেকে শুধু এই ছন্দেই কাব্য-রচনা করবে। কাব্যের বিষয় ও অবিষয়ের ভেদ সম্পূর্ণ লুপ্ত হ'লো। প্রমাণ হয়েছে সব বস্তুই উপাদান হিসাবে কাব্য-রচনার সমান উপযোগী। আর এ নবীন কাব্যের যে দৃষ্টি-ভঙ্গী, যথার্থ কাব্যের তাই একমাত্র দৃষ্টি-ভঙ্গী। কারণ এ দৃষ্টি সত্য-দৃষ্টি। যে বস্তু যা এ কাব্য তাকে ঠিক তেমনি দেখায়; কোনও মায়ার সৃষ্টি করে না। এ কাব্য অসৎ থেকে সৎ-এ উত্তীর্ণ হয়েছে। কোদালকে কোদাল না ব'লে এ কখনও খনিত্র বলে না।

কোনও চক্ষুষ্মান কাব্য-পাঠক কাব্যের এই অদ্বৈতবাদ মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীকার করবে না। কাব্য-রসিকের কাছে এর চেয়ে কোন্ সত্য বেশী স্পষ্ট যে কাব্যের রূপ এক নয়, কাব্য বহুরূপী! ওর ছন্দ, ওর বিষয়, ওর ভঙ্গীর নানাত্বই কাব্যকে করেছে আনন্দের অফুরন্ত উৎস। নূতন এসে এখানে প্রাচীনকে বাতিল করে না, তার সঙ্গে যোগ হ'য়ে কাব্যের ভাণ্ডার বাড়ায়; যেমন প্রাচীন মহাকবির কাব্য নবীন সুকবির কাব্য-প্রচারে বাধা নয়। উরিপিডিস সফক্লিসকে বাতিল করে নি, আর সেক্স্পীয়রের পরেও বার্নার্ড-শর নাটক লোককে আনন্দ দেয়। মেঘদূতে যে মুগ্ধ বৈরাগ্য-শতক তার কাছে হেয় নয়। কাব্যের এই বৈচিত্র্য কেবল বহু যুগের কাব্য একসঙ্গে পাওয়ার ফল নয়। যদি সৌভাগ্য হয় তবে এক যুগের এক সাহিত্যেই কবি-প্রতিভা নানা বিভিন্ন ভঙ্গীর ও বিভিন্ন গড়নের কাব্য সৃষ্টি করে। যদি কোনও সময়ে একই রীতি কাব্য রচনায় সংক্রামক হ'য়ে দেখা দেয় তার কারণ এ নয় যে কাব্যের এক চরম অদ্বৈত রীতির আবিষ্কার হয়েছে যা সকল কবিই অঙ্গীকার করতে বাধ্য, তার কারণ প্রতিভার অভাব। নব-নব-উন্মেষশালিনী সৃষ্টিক্ষমতার দুর্ব্বলতায় হীন-শক্তি কবিরা গতানুগতিক পথেই কাব্য রচনা করে।

বহু আধুনিক কবির যে দৃষ্টি-ভঙ্গী অনেকের মনে হয়েছে মোহমুক্ত, সুতরাং পুরা-সত্য, তা একটি বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গী ছাড়া আর কিছু নয়। প্রতিভাবান কবির প্রতিভা সে দৃষ্টির

যদি অনুকূল হয় তাঁর রচনায় নূতন রসের আস্বাদ পাওয়া যাবে ; এবং তা হবে না কেবল নূতন, হবে কাব্য। কিন্তু সে কাব্য কোনও প্রাচীন কি সমসাময়িক কাব্যকে বাতিল করবে না, যাদের দৃষ্টি-ভঙ্গী পৃথক। কারণ বস্তু সম্বন্ধে সত্যপ্রচার কাব্য নয়। বস্তুর বাস্তবতা কাব্যের উপাদানমাত্র। আর সে বাস্তবতা অনন্ত ; তার সমগ্রতা কোনও কাব্যের বিষয় নয়, কোনও বিজ্ঞানেরও বিষয় নয়। বস্তুর কোনও বিশেষ দিক্ কবিকে উদ্বুদ্ধ করে ভাব-বিশেষকে রূপ দিতে। অন্য দিক্ ভিন্ন কবিকে উদ্বুদ্ধ করে, অন্য ভাবকে রূপ দিতে। এ দিক্ ও ভাবের মধ্যে চরম কিছু নেই। বস্তুর কোন্ বাস্তবতা কবিকে প্রেরণা দেবে তা নির্ভর করে তাঁর মনের গড়নের উপর। তাঁর কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে ভাবের প্রেরণাকে রূপে গ'ড়ে তোলার দক্ষতার উপর। এ সব দিক্ ও ভাবের একের উপর অন্যের কোনও স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শরীরের মধ্যে যে কঙ্কাল আছে তা নিয়ে কাব্য লিখলেই কাব্য হবে বড়, না কঙ্কালকে ঢেকে দেহের যে সুষমা তার কাব্যই শ্রেষ্ঠ কাব্য—এ তর্ক তোলে তারাই কাব্য কাকে বলে তার জ্ঞান যাদের নেই।

নূতন যখন আসে তখন তার নবীনত্বের বিস্ময়ে অনেক সময় মনে হয় প্রাচীন বুঝি বাতিল হ'লো। মাইকেল বাঙ্গলা কবিতায় অমিত্রাক্ষর প্রবর্ত্তন ক'রে মিত্রাক্ষরকে বলেছিলেন কবিতার পায়ের বেড়ি। শিল্পীর কাছে ও যে শিকল নয় নূপুর তখন তা মনে হয় নি। কিন্তু কাব্যে ও সাহিত্যে নূতন রীতি ও ভঙ্গী যা সঞ্চিত তাকে সমৃদ্ধ করে না, প্রাচীনকে দূর ক'রে তার জায়গা দখল করে, বর্ত্তমান যুগে এ ধারণার একটু বিশেষ কারণ আছে। সে কারণ বেদান্তীরা যাকে বলে অধ্যাস—একের ধর্ম্ম অন্যের উপর আরোপের ফলে মিথ্যাজ্ঞান। এ যুগে মানুষের মনের উপর দুটি জিনিষের প্রভাব অসীম—এক যন্ত্র, দ্বিতীয় ইভলিউশন-তত্ত্ব। গত দেড়-শ বছরের যন্ত্রের অদ্ভুত উন্নতি ও আশ্চর্য্য প্রসার আমাদের মন স্বভাবতই আবিষ্ট করেছে। যন্ত্রে দেখা যায় নূতন কৌশলের আবিষ্কার পুরাতন কৌশলকে একেবারে বাতিল করে। কারণ এখানে নূতন অর্থ উন্নত—কাজের বেশী উপযোগী। প্রথম কালের বাইসিকিল্ কি মোটর গাড়ী আজ একেবারে অচল। এই যান্ত্রিক মনোভাব আমরা বুদ্ধির অজ্ঞাতেই প্রয়োগ করি যা যন্ত্র নয় তার উপর, এবং কল্পনা করি নূতন কেবল নবীন নয় তা উন্নত, সুতরাং তার আবির্ভাবে পুরাতন বিদায় হবে। ইভলিউশন তত্ত্বে আজকের মানুষ প্রগাঢ় বিশ্বাসী : ঠিক ওর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে নয়, যতটা ওকে অবলম্বন ক'রে যে নব রূপকথা প্রচার হয়েছে সেই গল্পে। পৃথিবীতে যে সব জন্তু ও উদ্ভিদের জাতি বর্ত্তমানে আছে তারা

চিরকাল ছিল না। এবং তারা হঠাৎ সৃষ্টিও হয় নি। অল্প কয়েকটি জাতির জীব ও উদ্ভিদ লক্ষ লক্ষ বৎসরে বহু ধারায় পরিবর্ত্তিত হ'তে হ'তে পৃথিবীর বর্ত্তমান জীব ও উদ্ভিদে পরিণত হয়েছে। এই পরিবর্ত্তনের ধারার স্তরে স্তরে যে সব শ্রেণীর প্রাণী জন্মেছিল সে সব শ্রেণী আজ বেঁচে নেই, পরিবর্ত্তনের ধারার শেষ পরিবর্ত্তিত জাতিগুলি কেবল বর্ত্তমান আছে। মানুষের সকুল্য ও সমানোদকেরা আছে, তার মূল বংশের কোনও পূর্ব্বপুরুষ টিকে নেই। এই পরিবর্ত্তনের ধারায় পর পর যে সব শ্রেণীর উদ্ভব হ'য়েছে তার পূর্ব্বগামী শ্রেণীর চেয়ে পরাগত শ্রেণীর প্রাণ ও বংশ রক্ষার যোগ্যতা মোটের উপর বেশী। এর যে ব্যত্যয় হয় নি তা নয়, এবং এ ধারা যে অনন্তকাল চলবে তাও নয়। কারণ কোন্ পরিবর্ত্তন টিকে যাবে তা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তনের উপর, এবং প্রাণীর শরীরে এই পরিবর্ত্তনের কারণ আজও কেউ জানে না। কিন্তু সে সব তর্ক সরিয়ে রেখে ইভলিউশনের লৌকিক ব্যাখ্যা দাঁড়িয়ে গেছে ক্রমোন্নতি। এবং জৈব বিজ্ঞানের সূত্রকে দার্শনিক তত্ত্ব ক'রে এ যুগের লোকে কল্পনা করেছে যে পরিবর্ত্তন অর্থই উন্নতি ; সুতরাং পরে যা আসে তাই শ্রেষ্ঠ। কুসংস্কারের যুগে লোকে ভাবতো সব কিছুরই ক্রমে অবনতি অবশ্যম্ভাবী, কারণ সত্যের পর কলি। বিজ্ঞানের যুগে সে কুসংস্কার দূর হয়েছে ; আমরা জানি সব জিনিষেরই ক্রমোন্নতি অবশ্যম্ভাবী, কারণ ইভলিউশন।

ডারুইন তত্ত্বের প্রধান মল্ল টমাস হাক্সলি তাঁর বিখ্যাত রোমানিস বক্তৃতায় দেখাতে চেয়েছিলেন যে জৈব ইভলিউশনের যে ধারা মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে তার কোনও প্রয়োগ নেই। মানুষের সভ্যতাবৃদ্ধির পথ জৈব ইভলিউশনের সমান্তরাল নয় ; অনেক জায়গায় সে পথ তার বিপরীত ও বিরুদ্ধ পথ। ইভলিউশনের রূপকথা যারা শুনেছে তাদের কাণে এ সব বুদ্ধিভেদী ব্যমিশ্র কথা পৌঁছে নাই। ক্রমোন্নতি যে অবশ্যম্ভাবী তাই জেনে তারা খুসী।

যন্ত্র ও ইভলিউশন যে আমাদের মগ্ন-চেতনা থেকে কাব্য-বিচারে অনেক বিপর্য্যয় ঘটাচ্ছে সাইকো-অ্যানালিসিস্ না ক'রেও তা বলা চলে। নইলে কাব্যের জগতে একে অন্যকে বাতিল করার কথা কেমন ক'রে ওঠে! কাব্যের জগৎ স্পষ্টই বহু-দৈবত বৈদিক জগৎ ; হিব্রু জিহোবার এখানে প্রবেশ মারাত্মক, যিনি নিজেকে ছাড়া আর কোনও দেবতা সইতে পারেন না।

গদ্য ও পদ্য

বুদ্ধদেব বসু

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় গদ্য ও পদ্য দুই সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র মহাদেশ, স্পষ্ট সীমান্তরেখায় বিভক্ত। কিন্তু সত্যই কি তাই? গদ্য ও পদ্যের মধ্যে যে ব্যবধান তা কি স্বাভাবিক, না কি ব্যবহারিক সুবিধের জন্যে মানুষের তৈরি, আজকের দিনে গদ্য-ছন্দের সিদ্ধি এই প্রশ্নের অবকাশ দেয়। এ আলোচনায় যে কথাগুলো জড়িত, গদ্য, পদ্য, কবিতা, ছন্দ, এদের সংজ্ঞা সব সময় আমাদের মনে খুব স্পষ্ট নয়। যেমন, পদ্য ও কবিতা এ দুটি শব্দ থাকায় আমাদের মনে একটি অত্যন্ত দরকারি ভেদজ্ঞান জন্মেছে; কিন্তু গদ্য সব সময়েই গদ্য, ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষার্থীর রচনা, নব-বিবাহিতার পত্র, রয়টারের তার, গণ-নায়কের বক্তৃতা, 'বীরবলের হালখাতা', 'ছিন্নপত্র', 'গলিভর্স ট্রাভল্‌স্‌' 'ইউলিসিস' এতগুলি বিভিন্ন পদ্ধতির ও উৎকর্ষের বিভিন্ন স্তরের, রচনা সবই একটিমাত্র নামে অভিহিত। তার উপর, ইংরিজি 'prosaic' বিশেষণটি গদ্যের প্রতি দারুণ অবিচার করে; যা নীরস ও শুষ্ক, গদ্য যেন তারই বাহন। গদ্যের পক্ষে 'poetic' হওয়া দোষের নয়, কিন্তু কবিতা 'prosaic' হ'লে সর্বনাশ, এতকাল এ-ধারণাই প্রচলিত ছিল; অনেক গদ্য যে 'poetic' হবার জন্যই খারাপ, এবং 'prosaic' ব'লেই খারাপ যে খুব কম কবিতাই, এ-সত্যের প্রতি এলিয়টই প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আসলে সব দেশেই আলঙ্কারিকেরা কবিতা নিয়েই মাথা ঘামিয়েছেন, গদ্য-বিচার মোটামুটি খামখেয়ালিভাবেই হয়েছে। গদ্যের প্রতি সমালোচকের এই অবজ্ঞার কারণ বোঝাও শক্ত নয়। যদিও মানুষ বরাবরই গদ্যে কথা বলেছে, তবু সভ্যতার সূত্রপাত থেকে রেনেসাঁসের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সমগ্র সাহিত্যই পদ্যে রচিত; এবং যদিও শ'চারেক বছর ধ'রে ছাপাখানার দৌলতে মানুষ স্মৃতিশক্তির তাঁবেদারি থেকে মুক্তি পেয়েছে, তবু, কোনো-কোনো পণ্ডিতের ভবিষ্যৎবাণী সত্ত্বেও, পদ্যের মুমূর্ষুতার এখনো কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আধুনিক যুগে মহাকাব্য ও কাব্যনাট্যের জায়গা গদ্য উপন্যাস দখল ক'রে কবিতার প্রচার অনেক কমিয়ে দিয়েছে সে-কথা সত্য, কিন্তু অল্প যে-ক'জন কবিতা ভালো-বাসেন, তাঁদের মনে ছন্দের প্রতিপত্তি এখনো অসীম। তাছাড়া, পারতপক্ষে কবিতা যাঁরা পড়েন না, তাঁরাও ছন্দের মোহ সম্বন্ধে একেবারে নিঃসাড় নন, কবিতার যেটুকু তাঁদের কানে

ভালো লাগে, শুধু সেটুকুই তাঁরা মানেন, অর্থাৎ কবিতা বলতে পদ্যই বোঝেন, যে-জন্যে গদ্য-কবিতার নাম শুনলেই তাঁদের হাসি পায়। পৃথিবীর ইতিহাসে পদ্যের দীর্ঘ আধিপত্যের কথা ভাবলে এতে অবাক হবার কিছু নেই। মানুষের সভ্যতার বর্তমান আয়ু যদি ছ' হাজার বছর ধরা যায়, তার মধ্যে সাড়ে-পাঁচ হাজার বছরই পদ্য ছিলো সাহিত্যের একমাত্র, অন্তত প্রধান, বাহন। গ্রীক ও হিন্দুদের মধ্যে শুধু কবিতা নয়, যে-কোনো শাস্ত্রই পদ্যে গাঁথবার রীতি ছিলো, মায় চিকিৎসাশাস্ত্র, আইন, কৃষিবিদ্যা। তার কারণ আর কিছুই নয়, পদ্য মনে রাখা সোজা। সংস্কৃতে যে-গদ্যরচনা সাহিত্য ব'লে স্বীকৃত হ'তো, আসলে তা কবিতাই; কবিতার সমস্ত লক্ষণ, উপমা অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার, কবিতার নিগূঢ় ইঙ্গিতময়তা—'কাদম্বরী'তে এ সবই আছে। প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা 'কাদম্বরী'কে গদ্য-কাব্য বলেছেন। সংস্কৃতে কাব্য ও সাহিত্য একার্থবাচক, লেখকমাত্রেই কবি।

এ থেকে বোঝা যায় গদ্য ও পদ্যের সীমান্তরেখা তখনো নির্ধারিত হয়নি। ক্রমে হস্তলিপির প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে সাংসারিক ও পার্থিব প্রয়োজনের বিষয়গুলি গদ্যে লেখা হ'তে লাগলো, যদিও সাহিত্য মোটামুটি আবদ্ধ রইলো পদ্যেই। গদ্যের সঙ্গে আমাদের মনে যে একটি নীরস, মুদিখানা-আবহাওয়ার সংযোগ, ইংরেজি 'prosaic' বিশেষণটি যে এমন মারাত্মক, তার মূল কারণ এখানেই খুঁজতে হয়। আস্তে-আস্তে মানুষ এটা বুঝতে শিখলো যে শব্জির চাষ কি মদ তৈরি করার উপায় বর্ণনা ছাড়া অন্যান্য কাজেও গদ্যকে লাগানো যেতে পারে; ইতিহাস, ভূগোল, নীতিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় পদ্যের চাইতে বরং গদ্যেই ভালো হয়, কেননা গদ্যে দ্ব্যর্থতার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। পুরাকালে ইতিহাস ও ভূগোল, ধর্ম ও নীতি সমস্তই ছিলো একই মহাকাব্যের অঙ্গীভূত; কিন্তু সামাজিক জীবনের জটিলতা যতই বাড়তে লাগলো, ততই বিবিধ বিষয়গুলি স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট রূপ নিয়ে কাব্যের শরীর থেকে খ'সে প'ড়ে গদ্যের প্রসারের পথ প্রশস্ত ক'রে দিলে। ইয়োরোপে মধ্যযুগের শেষে গদ্যের উত্থানের যে-ভীরু আরম্ভ চোখে পড়ে (সেরভান্টিস গদ্যে একটি বিরাট গল্পও লিখে ফেললেন) মহান মুদ্রাযন্ত্র তাকে সামনের দিকে এমন প্রচণ্ড ধাক্কা দিলে যে মাত্র দু'শো বছরের মধ্যে পদ্যকে কত শত শতাব্দীর প্রতিষ্ঠা থেকে চ্যুত ক'রে জনসাধারণের মনে গদ্য অগাধ আধিপত্য বিস্তার ক'রে বসলো। রাজন্যবর্গের অধঃপাত ও ব্যবসায়ী মধ্যবিত্তের উত্থানের সঙ্গে-সঙ্গে গদ্যের দিগ্বিজয় হ'লো সম্পূর্ণ।

এইভাবে ইয়োরোপে আঠারো শতকে (ও আমাদের দেশে উনিশ শতকে, অর্থাৎ ইংরেজ আসার পরে) গদ্য ও পদ্যের ভেদরেখা নির্দিষ্ট হ'য়ে উঠলো। কবি ও লেখক একার্থ না হ'য়ে কবি ও গদ্যলেখক এই দুটি স্বতন্ত্র সংজ্ঞার সৃষ্টি হ'লো, গদ্য ও পদ্যের উদ্দেশ্য ও

সিদ্ধি যে আলাদা, সে-বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেখা দিলো। এমন ব্যক্তি, যিনি কোনোকালেও কবি হবেন না, (Cousin Swift, you will never be a poet.') তিনিই হ'লেন আঠারো শতকের প্রধান ইংরেজি গদ্যলেখক, যদিও ড্রাইডেনের উভমুখী প্রতিভা প্রমাণ করলে যে গদ্য ও পদ্য লেখার ক্ষমতা একই আধারে থাকা সম্ভব। তবু গদ্য-পদ্যের পৃথকীকরণের এমন একটা অবস্থাও দেখা যায়, যখন একাধারে কবি ও গদ্যলেখক হওয়া প্রায় অসম্ভব হ'য়ে উঠেছিলো। উনিশ শতকের প্রধান কবিদের গদ্যবিমুখিতা সহজেই চোখে পড়ে (যদিও শেলি কি কীটস ব্যক্তিগত পত্রে, বা প্রচারের তাগিদে, যে গদ্য লিখেছেন তা খুবই ভালো); আবার সে-যুগের গদ্যলেখকরা কবি-হিসেবে নগণ্য। রোমান্টিক জোয়ারের যখন অবসান, তখনই আবার এমন লেখক দেখা দিলেন যিনি মুখ্যত কবি হ'য়েও প্রচুর ও উৎকৃষ্ট গদ্য লেখক, যেমন ইএট্স্; কিংবা মুখ্যত ঔপন্যাসিক হ'য়েও প্রচুর ও উৎকৃষ্ট কবিতার প্রণেতা, যেমন হার্ডি।

ইংলণ্ডে আঠারো শতককে গদ্যের যুগ বলা হয়। কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়, কেননা গদ্যের স্বতন্ত্র সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করা সে-যুগেরই কীর্তি। এলিজাবেথীয় গদ্য অলঙ্কার ও বাগাড়ম্বরে নিষ্পেষিত, পদ্যের নেশায় ভরপুর। টমাস ব্রাউনের মতো মহৎ লেখককেও শেষ পর্যন্ত গদ্যে কবি বলা ছাড়া উপায় থাকে না, কেননা তাঁর রচনা যেখানে মহৎ, সেখানে তা ঠিক কবিতার মতোই পাঠকের মনে কাজ করে। অর্থাৎ, যথার্থ গদ্য তখনো গঠিত হয়নি। এ-হিসেবে ফরাসি গদ্য ইংরেজির তুলনায় অগ্রণী; সুইফ্‌টএর অনেক আগে প্যাস্কেল বিশুদ্ধ গদ্যের যে উদাহরণ জগৎকে দিয়েছিলেন, আজও তা জগতে অতুলনীয়। 'বিশুদ্ধ' বলতে সেই গদ্যকে বোঝায় যা পদ্যের সমস্ত কলাকৌশলবর্জিত; যা ঋজু, সরল ও স্বচ্ছ, যার একের বেশি দু'রকম মানে হয় না, যা ঠিক যেটুকু বলবার সেটুকুই বলে, তার বেশি (কি কম) বলে না, এবং যেটুকু বলে, বলে নির্ভুল নিখুঁতভাবে। উপমার সাহায্য তাকে নিতে হয় না, এমন কি বিশেষণের ব্যবহারও সংকীর্ণ। এই যদি গদ্যের আদর্শ হয়, তাহ'লে যেখানেই পাঠককে নির্ভুলভাবে কিছু জানানো দরকার, সেখানেই দ্রুতগামী ও বহুরূপী পদ্যকে ছেড়ে পদাতিক ও সাদাসিধে গদ্য ভরসা। বর্ণনা কি বিবৃতি, বিতর্ক কি কথকতার ক্ষেত্র গদ্য তাই আজ জুড়ে বসেছে। যাকে সাদা গদ্য কি plain prose বলা হয়, আসলে তার জায়গা বহু উঁচুতে, তা আয়ত্ত করাও দুরূহ। তার জন্যে দরকার, প্রথমত অভ্রান্ত ও সম্পূর্ণরূপে দেখবার ক্ষমতা, দ্বিতীয়ত অতি পরিষ্কাররূপে চিন্তা করবার শক্তি। এ দুটি থাকলে অপেক্ষাকৃত পরিমিত শব্দসংখ্যা নিয়েও কাজ চালানো যায়। আমরা বিষয়কে ভালো ক'রে লক্ষ্য করিনে, কিংবা কী বলতে চাই নিজেই ভালো ক'রে জানিনে,

তাই কথার উপর কথা, বিশেষণের পরে বিশেষণ, কোটেশনের পিঠে কোটেশন চাপিয়ে নিজেরাও হাঁপিয়ে উঠি, পাঠককেও বিমূঢ় করি। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়, রাজনৈতিকের বক্তৃতা, উচ্চ ডিগ্রিকামীর থিসিস এবং নানা শ্রেণীর বহু গদ্য রচনাই সাদা গদ্যের অনেক দূরে—দেখতে ও শুনতে এরা জমকালো, তার মানেই ঘোলাটে; কথাগুলি কেবলই পেঁচিয়ে যাচ্ছে, তার ভিতর থেকে বক্তব্য আন্দাজে বুঝে নিতে হয়, যদি না তা একেবারেই চাপা প'ড়ে যায়। অন্য পক্ষে, প্যাস্কেলের একটি ক্ষুদ্র বাক্য, অতি সহজ, সাধারণ ভাষায় লেখা, তা পড়বার সঙ্গে-সঙ্গে মনের মধ্যে তাৎপর্যটা গেঁথে যায়; মনে হয় লেখক যা বলতে চান, ও যেভাবে সেটা বলেছেন এ দুই যেন একই বস্তু। অনেক সময়, আবার, গদ্য তার ঝঙ্কারে, কল্লোলে, তার চিত্ররূপের ঐশ্বর্যে আমাদের মুগ্ধ করে, যেমন পেটারের গদ্য; কিন্তু সেখানেও বলতে হয়, লেখকের কবিত্বশক্তিতেই আমরা আচ্ছন্ন হই, কেননা ও-সমস্ত গুণ বিশুদ্ধ গদ্যে অবৈধ। ইংরেজিতে plain proseএর অনিন্দ্য দৃষ্টান্ত গলিভর। এ-গ্রন্থে ধ্বনির ইন্দ্রজাল কি উপমার বর্ণচ্ছটা নেই; পাতার পর পাতা নির্জলা কথকথা, কি শুদ্ধ বিতর্ক প'ড়ে যেতে-যেতে ভাষা সম্বন্ধে কখনো সচেতন হবারই অবকাশ হয় না। লেখক যা বলছেন তা এতই সারবান ও হৃদয়গ্রাহী যে ভাষার সৌষ্ঠব তারিফ করবার সময়ই আমাদের নেই। এখানে বক্তব্য বিষয়ই সব, ভাষা তাঁর ন্যূনতম বহিরঙ্গ মাত্র। বিশুদ্ধ গদ্য এ-ই।

তাহ'লে গদ্য ও পদ্যের স্বাতন্ত্র্য স্বতঃসিদ্ধ হয়ে পড়ে—যদি এটা মেনে নেয়া যায় যে সব কবিতাই পদ্যে লেখা হয়। কেননা গদ্যে যা বর্জনীয়, পদ্যের তা-ই উপজীব্য। ছন্দ যে-কুহকের সৃষ্টি করে, সেটাই কবির পক্ষে সিদ্ধির প্রধান উপায়। নিয়মিত যতিপাত মানুষের মনে একটি আদিম সুখের সঞ্চার করে; তারই সুযোগ নিয়ে নিপুণ কবি পাঠককে সম্মোহিত করেন। এই সুবিধেটা আছে ব'লে গদ্যলেখকের তুলনায় কবির দায়িত্ব কিছু কম। তাঁর রচনা 'বোঝা' গেলো কিনা, সে-প্রশ্ন অবান্তর। তাঁর বক্তব্য পাঠকের কাছে পরিষ্কার হ'লো কিনা, বা হ'লেও পাঠক তাঁর কথা মেনে নিলেন কিনা, এ-সব ভাবনা কবির নেই। গদ্য-লেখকের পক্ষে প্রতিটি কথার একটি স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট মানে আছে, সেটা নিছক অভিধানগত; কবির শব্দব্যবহার অভিধান ছাড়িয়ে অনেক দূর চ'লে যায়। প্রতিটি কথার দু'রকম মানে হ'তে পারে: একটি অভিধানগত, অন্যটি ভাবগত; কবির কারবার দ্বিতীয়টি নিয়ে। যে-কোনো সাধারণ কথার আড়ালে যে-বিরাট ভাবমণ্ডল নিহিত থাকে, তার ব্যবহার যে-কবি যত বেশি করতে পারেন, তাঁর কৃতিত্ব ততই বড়ো। কবিতা এইজন্যে ইঙ্গিতময়। কবি যা বলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়। একটি কথা অর্ধ-সমাপ্ত রেখে পরের কথাটিতে পর-পর চারটে উপমা প্রয়োগ করবার স্বাধীনতা তাঁর আছে, কেননা তিনি

কোনো জিনিসের ব্যাখ্যা বা বিবৃতি (উপমা বা রূপকের সাহায্য ছাড়া কবিতায় বর্ণনাও অচল) করছেন না; তাঁর উদ্দেশ্য পাঠককে এমন একটা মানসিক অবস্থায় নিয়ে আসা যাতে তাঁর অনুভূতিগুলি পাঠকের মনে সংক্রামিত হ'তে পারে। কবিতা মানুষের আদিম শিল্প, গদ্য সভ্যতার সৃষ্টি; গদ্যের তুলনায় কবিতা তাই বর্বর। বর্বর ম্যাজিক থেকে কবিতা এখনো সম্পূর্ণ বিছিন্ন হয়নি।

উপরের অংশে আমি পদ্য ও কবিতাকে এক অর্থে ব্যবহার করেছি। পদ্য ও কবিতা যে এক বস্তু নয়, তা আমরা সকলেই জানি; কিন্তু গদ্যের বেলায় এইরকম আলাদা দুটি শব্দ না-থাকায় কখনো-কখনো এ দুটিকে এক ব'লে ধরলে সুবিধে হয়। যা নেহৎই পদ্য, কোনো-শ্রেণীরই কবিতা নয়, তাকে গদ্যের বিপরীত হিসেবে ধরলে গদ্যের প্রতি খুবই অবিচার হয়। আর এতে বিশেষ অন্যায়ও হয় না, কারণ আজকের দিনেও পৃথিবীর বেশির ভাগ কবিতা পদ্যেই লেখা হচ্ছে। তাহ'লেও, গদ্যের স্বাতন্ত্র্য অর্জন ও প্রতিষ্ঠা লাভের প্রতিক্রিয়া পদ্যের উপরে যথেষ্ট হয়েছে ও হচ্ছে। ওঅর্ডস্বর্থ ইংরেজি কাব্যে যে-বিপ্লব আনেন তার মূলে বর্ধিষ্ণু গদ্যের সঙ্গে পদ্যের শক্তি-পরীক্ষার ভাব ছিলো। কেবল সরল ও অনাড়ম্বর হ'য়েই কি গদ্য জিতে যাবে? পদ্যও কি তা পারে না? অলঙ্কারের আতিশয্য, সাদা কথার বদলে 'ক্যাবিক' কথা, বাক্যরচনার যে-ভঙ্গি poetic diction ব'লে পরিচিত—সবই তিনি বর্জন করলেন; দেখা গেলো, সাধারণ ভাষাতেও পদ্য জমে, কোনো অলঙ্কারই অপরিহার্য নয়, অতি সাধারণ কয়েকটি কথার ভাবগত অর্থ সম্পূর্ণ নিষ্কাষিত ক'রেই মহৎ কবিতা হ'তে পারে।

No motion has she now, no force,
She neither hears nor sees,
Rolled round in earth's diurnal course
With rocks and stones and trees.

অবশ্য ওঅর্ডস্বর্থকে সকলেই একবাক্যে মেনে নেননি; আঠরো শতকের শেষ প্রতিনিধি বায়রনের ব্যঙ্গ ('Prose is merely verse and verse is prose') কার না মনে আছে? আসলে, গদ্য ও পদ্যের তর্ক সেদিন থেকেই সুরু। গদ্য ও পদ্যের নির্দিষ্ট সীমারেখা আলাদা ক'রে দিয়েই, তাই, এ-প্রসঙ্গের শেষ হয় না, এবং এ-যুগে গদ্য-কবিতার আবির্ভাব একে আরো জটিল ক'রে তোলে। মনে হয়, ওঅর্ডস্বর্থ-এর সময় থেকে পদ্য অবিশ্রান্ত গদ্যের অনুকরণ ক'রে আসছে, এবং শেষ পর্যন্ত ছন্দের শেষ বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে কবিতা সোজাসুজি গদ্যের রূপেই দেখা দিলো। এও মনে হ'তে পারে যে পদ্যের গুণ নকল করতে গিয়ে গদ্য প্রথম অবস্থায় নিজেকে বিক্ষত করেছে, কিন্তু গদ্যের অনুকরণে পদ্যের লাভ ছাড়া ক্ষতি হয়নি। ওঅর্ডস্বর্থ যেখানে খুব ভালো উৎরেছেন সেখানে তাঁর শব্দনির্বাচন

ও বাক্যরচনার অপূর্ব সরলতা এখনো প্রত্যেক কবির বিস্ময়ের ও ঈর্ষার বস্তু। কবিতার স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বজায় রেখে তার চেহারাটা প্রায় গদ্যের মতো ক'রে তোলা আধুনিক কবির সাধনা। এলিয়ট-এর 'Family Re-union'-এর পদ্যকে গদ্য থেকে চেনবার উপায় নেই; বায়রন-এর ব্যঙ্গ এ-ক্ষেত্রে অক্ষরে-অক্ষরে প্রযুজ্য।

এদিক থেকে দেখলে গদ্যে যে আজকাল কবিতা লেখা হচ্ছে, এটা তেমন কিছু চমকপ্রদ ঘটনা নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে কবিতার গুণসম্পন্ন গদ্যের দেখা যখন মেলে, তখন এ-বস্তু নতুন শুধু এই অর্থে যে একে কবিরা গদ্যরচনা না-ব'লে কবিতা বলছেন, এবং ঠিকই বলছেন। এতে শুধু এই প্রমাণ করে যে যা গদ্য তা কবিতা হ'তে পারে না, এই কুসংস্কার কবিরা এতদিনে কাটিয়ে উঠেছেন। (স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'লিপিকা'কে কাব্যগ্রন্থ বলেননি, যদিও 'পুনশ্চ'কে বলেছেন।) সত্যি যেটা বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করবার সেটা এই যে পদ্যের বর্তমান লক্ষ্য গদ্যের গঠন ও বাক্যবিন্যাস আয়ত্ত করা; অর্থাৎ, স্পীচ্-রিদ্‌মই আধুনিক কাব্যের মূল কথা। গদ্যে স্পীচ্-রিদ্‌ম্ স্বভাবতই আসে; মানুষের মুখের কথার যে-বিন্যাস, গদ্যের বিন্যাসও তা-ই এ অবশ্য জানা কথাই, আর এইজন্যেই গদ্য কবিতায় কবি একটি বিশেষরকমের মুক্তি পান। পদ্যে প্রতিটি বাক্যকে মুখের কথার ব্যাকরণে ও ধ্বনিতে বিন্যস্ত করা সহজ নয়, কিন্তু অসম্ভবও নয়, এবং সেটা যেখানে হয়, সেখানে গদ্যের সরলতার সঙ্গে পদ্যের ধ্বনি ও কবিতার ইঙ্গিতময়তা যুক্ত হ'য়ে একটি অপূর্ব রূপকল্পের সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ 'পরিশেষে' এ-জিনিসই চেষ্টা করেছেন, এবং তিনি যাতে হাত দেন তাতেই কৃতী হন, এ-কথা বলাই বাহুল্য। তবে ও-কবিতাগুলিকে তিনি অপেক্ষাকৃত লঘু বিষয়েই আবদ্ধ রেখেছেন; তাছাড়া বেশির ভাগ কবিতাতেই গল্পের একটি ক্ষীণ সূত্র আছে, পাঠকের মনোযোগ দখল করবার পক্ষে সেটা একটা মস্ত সহায়। তিনি দেখেছেন যে এ-ধরণের রচনার সেই পয়ারই সব চেয়ে উপযোগী, যাঁর পংক্তিগুলো অসম, আর যাতে যুক্তাক্ষরের সংখ্যা কম। তাতে ছন্দের চালটা হয় হালকা, আর বাংলা চলতি ক্রিয়াপদ অনায়াসেই মানিয়ে যায়। যে-কবিতার বিষয় লঘু, কিম্বা যাতে আখ্যায়িকার মিশেল আছে, তার পক্ষে 'পরিশেষে'র ছন্দ উৎকৃষ্ট; কিন্তু বিষয় যেখানে গম্ভীর ও উপাখ্যানহীন, কিংবা গীতি-কবিতায়, এ-ছন্দ ঠিক মানায় না। তাই ব'লে সে-সব ক্ষেত্রে বাক্যবিন্যাসের 'কাব্যিক' পদ্ধতিতেই যে ফিরে আসতে হবে, এ-কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই; বাংলা পয়ারকে দিয়ে যে-কোনো কাজই করানো যায়।

পয়ারের প্রতি আমার, এবং আমার মনে হয় বাংলা কবিতার, প্রচণ্ড পক্ষপাত। অসমমাত্রার পয়ার, রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'য় যা প্রবর্তন করেন, গম্ভীর বিষয়ের পক্ষে এর চেয়ে

উৎকৃষ্ট বাহন আমাদের ভাষায় নেই। তবে বিষয় যেখানে গম্ভীর, সেখানে যুক্তাক্ষরকে প্রাধান্য দিতেই হয়। (অবশ্য বিশেষ-কোনো অংশে বিশেষ-কোনো উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কবি যদি যুক্তাক্ষরকে দু'মাত্রা ধরেন তাতে আমার আপত্তি নেই।) আমার মনে হয়, বাক্যরচনা যদি হুবহু গদ্যের ব্যাকরণ মেনে চলে, 'সম' 'তব' 'হনু' 'কোথা' ইত্যাদি 'কেবল পদ্যে ব্যবহৃত' সমস্ত কথা যদি সযত্নে বর্জন করা হয়, তার উপর কবি যদি 'সাধু' ক্রিয়াপদ সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলতে পারেন (হয়তো সেজন্যে তাঁকে অনেক সময় ক্রিয়াপদই বাদ দিতে হবে, কিন্তু 'করিতেছে' কিংবা 'হইতেছিলাম'-এর মতো কুৎসিত শব্দ ব্যবহার করবার চাইতে বরং ক্রিয়াপদ বাদ দেয়াই ভালো, এবং সুখের বিষয় বাংলায় তাতে অর্থের হানি প্রায়ই হয় না), এবং যে-সব কথা নিতান্তই পোষাকি বা 'সাহিত্যিক', সেগুলো যথাসম্ভব বাদ দেন, তাহ'লে সে-পয়ারে গদ্যের সুবিধেগুলো সবই পাওয়া যাবে, আবার পদ্যের জাদুশক্তিও সম্পূর্ণ বজায় থাকবে।

এই পয়ার আর গদ্য-কবিতা যে আসলে কত কাছাকাছি, সমর সেনের কবিতাগুলিই তার প্রমাণ। সমর সেনের কবিতার অনেক অংশই পয়ারে বাঁধা, অন্য অনেক অংশ একটু অদল-বদল করলেই খাঁটি পয়ারে দাঁড়িয়ে যায়। যে-গদ্যে কবিতা লেখা হয়, সে-গদ্য পদ্যের প্রদেশ বারে-বারেই দখল করে, কেননা সে-গদ্যেরও ছন্দই নির্ভর। সে-ছন্দ পদ্যের ছন্দের মতো নিয়মিত ও স্পষ্ট নয়, তবু সেটা ছন্দই। ছন্দ বাদ দিয়ে কোনোরকমের কবিতাই হয় না। এমন কবিতার অভাব নেই যা থেকে পাঠক গল্প কি তথ্য, সারবান যুক্তি কি গভীর তত্ত্বকথা; যা তিনি অন্যান্য গ্রন্থে পাবেন, কিছুই প্রত্যাশা করতে পারেন না, যার বক্তব্য খবরের কাগজের ভাষায় পরিণত করলে হয়তো খুবই ফ্যাকাশে দেখাবে, কিন্তু তবু যে-সব কারণে পাঠককে তা বন্দী ক'রে রাখতে পারে, ছন্দ তার মধ্যে প্রধান। গদ্য-কবিতাও, তাই, ছন্দকে অবহেলা করতে পারে না, (এবং সে-ছন্দ কতদূর শক্তিশালী হ'তে পারে, তা রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' কবিতাটি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই জানেন।) এমনকি মিল, মধ্য-মিল, স্বরবর্ণ-মিল প্রভৃতি পদ্যের কৌশলও যে সে প্রয়োজন মতো অঙ্গীকার ক'রে নেয়, তা আমরা আজকালকার বাংলা কবিতায় দেখছি। পদ্যের সত্তাকে নিজের শরীরে প্রবেশ করিয়ে তবেই গদ্য কবিতার স্তরে পৌঁছতে পারে; আসলে তা গদ্য শুধু এই অর্থে যে তাতে যতিপাতের নিয়ম পদ্যের মতো বাঁধা-ধরা নয়। গদ্য-কবিতার প্রচলনের ফলে গদ্য-পদ্যের বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হ'য়ে সাহিত্যে বিশৃঙ্খলা আসবে, এ-আশঙ্কা তাই অমূলক।

আলোচনা

সাহিত্য-সম্মেলন বিষয়ে

অজিত দত্ত

প্রতি বৎসর বাংলা দেশে ছোটো বড় গোটাকয়েক 'সাহিত্য সম্মেলন' নিয়মিত ভাবেই ঘটে। সম্মেলনগুলির কর্ম্মসূচী যাঁদের নাম দিয়ে সুরু হয়, তাঁরা অধিকাংশই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলকর্ম্মা ব্যক্তি এবং সেহেতু সাহিত্যিকদের নমস্য। এই সব প্রাতঃস্মরণীয়দের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং চাঁদা-আদায়-কুশলী ছাত্র এবং বেকারদের কর্মঠতার ফলে সাহিত্যের নামে যে যাত্রার আসর বসে তাতে জনমনবিমোহন নাচ, গান, রসিকতা প্রভৃতি কোনোটারই অভাব থাকে না, জনসমাগমও প্রচুরই হয়, ছাত্র থেকে সুরু করে পাটের দালাল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পর্যন্ত প্রায় সকলকেই রঙীন্ কাপড়ের ফুল পরে' ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়, দেখা যায় না শুধু সাহিত্যিককে।

এর কারণ খুবই স্পষ্ট। জনকয়েক যশোলিপ্সু সখের সাহিত্যিক ছাড়া অন্য প্রত্যেক প্রকৃত সাহিত্যিকপদবাচ্য ব্যক্তিই জানেন যে হৈ চৈ করে' কোনো শিল্প সৃষ্টি হয় না। তাঁরা আরো জানেন যে অসংখ্য অভিভাষণগুলিতে সাহিত্যের মূল সূত্র ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে-সব ফতোয়া জারি করা হয়, তার চেয়ে সহস্রগুণে ভালো লেখা অনেক ফতোয়া সাহিত্যের ইতিহাস বাতিল করে' দিয়েছে, যদিও কেবল লেখার গুণে সাহিত্য হিসেবেই তার কোনো-কোনোটা বেঁচে আছে। তা ছাড়া বিভিন্ন সাহিত্য-সম্মেলনে যে কয়েক হাজার লোক জমায়েৎ হয়, তার শতকরা একজনেরও যে সত্যিকারের সাহিত্য-প্রীতি নেই, সে-সংবাদ আজ আর কোনো সাহিত্যিকের অজানা নেই। যারা মজা দেখতে কিম্বা মাতব্বরী করতে জোটে তাদের কথা ছেড়েই দিলাম, উদ্যোক্তা, পৃষ্ঠপোষক, সভাপতি ও শাখাপতিদের অজ্ঞতাও যে সাধারণত কত পর্ব্বতপ্রমাণ হয়, সে-সম্বন্ধে একটা গল্প আছে; এবং সাহিত্যের দুরবস্থার কথা বিবেচনা করে' এ-গল্প সত্য বলে বিশ্বাস করতেই আমার প্রবৃত্তি হয়। শোনা যায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে কলকাতার এক সাহিত্য-সম্মেলনের কার্যকরী সমিতির সভায় কোনো রসিকতাপ্রিয় সাহিত্যিক গম্ভীরভাবে অভিযোগ করেন যে যেহেতু সত্যেন্দ্র দত্তের মত বিখ্যাত কবিকে নেমন্তন্ন করা হয়নি সেহেতু তিনি এই সম্মেলনে যোগ দিতে অক্ষম। সভাপতি এবং কার্যকরী সমিতির মহারথীগণ— যাঁরা বেতালভট্ট থেকে সত্যেন্দ্র দত্তের নামের তফাৎ জান্তেন না—স্বভাবতই অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েন এবং তক্ষুণি সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে সতেন্দ্র দত্তকে আন্তে গাড়ি পাঠানো হোক।

সাহিত্যের জ্ঞান যেখানে এত গভীর, সে স্থানকে তবে সাহিত্য-সম্মেলন বলা কেন। কর্মতালিকায় প্রায় বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন না করেও এ ব্যাপারটাকে 'জলসা' বা Fun Fair নাম দিলে ক্ষতি কি? বড়-লোকদের নাম যুক্ত থাকলে তাতেও খবরের কাগজে সম্পাদকীয় পাবার কোনো অসুবিধে হবে না। অথচ তাতে সাহিত্য জিনিষটা ছেলেখেলার হাত থেকে খানিকটা মুক্ত হয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। তা যে হবার নয় তা'র কারণ বাংলা সাহিত্যের এখনও যেটুকু মর্যাদা আছে তার সঙ্গে প্রায় প্রত্যেক বড়লোকই নিজের

নাম সংযুক্ত করতে চান। তা' ছাড়া সেটা সহজও বটে। বৈষ্ণব কবিতা দুটো চারটে কীর্ত্তনে শোনাই থাকে। হেম-নবীনের নামও পঠদ্দশায় শুনতে হয়েছে নিশ্চয়ই। রবীন্দ্রনাথের নামও শোনাই সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সাহিত্য সম্বন্ধে দুটো চারটে সারগর্ভ কথা বল্‌বার লোভ সাম্‌লানো দুষ্কর—এবং নিষ্প্রয়োজনও বটে। তবু একথা না বলে পারিনে যে সাহিত্যিকরা আধপেটা খেয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করবেন আর বড়লোকরা তাই ভাঙিয়ে সম্পাদকীয় সুখ্যাতি কিন্‌বেন এ-অবস্থা অসহ্য।

সকলেই জানেন বাংলাদেশে বাংলা বই বিক্রী হয় না। কথাটা একটু বিপরীত শোনালেও সত্য। প্রকাশকেরা একবাক্যে বলেন যে একমাত্র উপন্যাসই তাঁরা শ' পাঁচেক বিক্রী করতে আশা করেন যেহেতু বাংলাদেশে উক্তসংখ্যক লাইব্রেরী আছে। কোনো লোক শুধু নিজে পড়বার জন্যে একখানা বাংলা বই কিন্‌বেন এ-কথা বদ্ধপাগল হবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্যন্ত কোনো প্রকাশক বিশ্বাস করেন না। যদি বাংলাদেশের লোকের সাহিত্যের—বিশেষ করে' বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ এতই কম তবে সাহিত্য-সম্মেলনে এত ভিড় হয় কেন? বলা বাহুল্য সবাই মজা দেখতে যায়, যেমন যায় এক্‌জিবিসনে—কিম্বা চিড়িয়াখানায়।

আমাদের সাহিত্য কি আজ এতই অধঃপাতে গেছে যে বছরে চারবার করে' সম্মেলন খুলে' লোককে সাহিত্যের নাম স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে? না কি এই সব সম্মেলন খুলে' সাহিত্যিকের কোনো স্থায়ী কিম্বা অস্থায়ী উপকার করা হচ্ছে! বাংলাদেশে বই বিক্রী হয় না, তার কারণ, শোনা যায়, পয়সার অভাব। 'লোকে খেতেই পায়না বই কিন্‌বে কি দিয়ে,' এই কথাই সবাই বলে। বলা বাহুল্য এ-যুক্তি মাত্র স্বল্পাংশিক সত্য। তার প্রমাণ সিনেমা হাউসগুলি ফেঁপে উঠছে, তার প্রমাণ পুরোণো বইয়ের স্টল থেকে যত টাকার চতুর্থ শ্রেণীর ইংরেজী উপন্যাস বিক্রী হয়, তত টাকা বাংলা বইয়ের দিকে গেলে সাহিত্যিকদের অবস্থা একটু ফির্‌তো। আরো প্রমাণ, প্রতি বিয়েতে যত টাকার 'কাস্কেট' কেনা হয়, তত টাকায় প্রত্যেক দম্পতীকে একটা করে' লাইব্রেরী কিনে দেওয়া যায়। কিন্তু যদি ও যুক্তি সত্য বলেই মেনে নেওয়া যায়, তবু সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের এ প্রশ্ন আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি যে নাচানাচির পিছনে এতগুলি টাকা না ফেলে এ-টাকা দিয়ে স্থানীয় লাইব্রেরীর জন্য বই কেনা হয় না কেন? কিম্বা যাঁরা চাঁদা দেন তাঁরাই সে-পয়সা দিয়ে নিজেরা বাংলা বই কিনে পড়েন না কেন?

এ রকম ঘটনা আশঙ্কা করি প্রত্যেক সাহিত্যিকের জীবনেই কখনো না কখনো ঘটেছে যখন কোনো মহৎ ব্যক্তি অপর কোনো মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটিয়ে দেবার সময় উল্লেখ করেছেন যে 'ইনি লেখেন টেখেন' এবং যা 'ইনি গাঁজা টাজা টানেন' এর মতই লজ্জাকর শুনিয়েছে। শুদ্ধমাত্র লেখক বলে' পরিচয় দিয়ে কলকাতার সহরে বাড়ী ভাড়া পাওয়া যে কত দুঃসাধ্য তা উৎসাহী গবেষক পরীক্ষা করে' দেখতে পারেন। সাহিত্যের প্রতি আমাদের 'জাতীয়' শ্রদ্ধা এতই গভীর! তবুও বছরে চারটে করে' সাহিত্য-সম্মেলন আমাদের ডাকতেই হবে। ভগবান্ সাহিত্যকে রক্ষা করুন।

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু : সমর সেন। ৬১ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট "মঙ্গশাল প্রেস"
শ্রীকানাইলাল গুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত। প্রকাশক : বুদ্ধদেব বসু
কার্য্যালয়—কবিতা-ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

কবিতা ॥ বিদেশী সংখ্যা ॥ কার্তিক ১৩৪৬

কবিতা

বিদেশী সংখ্যা

কার্তিক ১৩৪৬